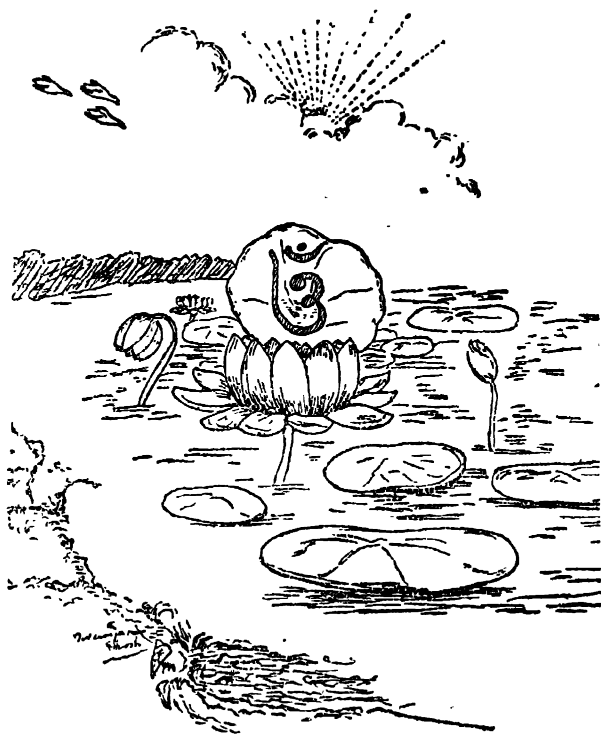
চিঠি ৫ম খণ্ড

তত্ত্বকথা



শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত

মণ্ডলীর অনুমত্যনুসারে—
"বুক কোম্পানী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত ;
৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৮

২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা,
ব্রাহ্মমিশন প্রেস ;
শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

"চিঠি"র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। কাশী হইতে মুদ্রিত "চিঠি—আধ্যাত্মিক" খণ্ডের সহিত এই "তত্ত্বকথা"র ঘনিষ্ঠ যোগ। এমন কি, উহাকে ইহার উপক্রমণিকা বলাও চলে। উহা পড়িলে "তত্ত্বকথা"র চিন্তাধারার অনুসরণ পাঠকদিগের পক্ষে সুগম হইবে।

কাশীতে মুদ্রিত "চিঠি—আধ্যাত্মিক" খণ্ড লইয়া এপর্য্যন্ত ছয় খণ্ড "চিঠি" ছাপা হইল। "তত্ত্বকথা" সম্বন্ধে যতগুলি চিঠি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকেই পুস্তকের কলেবর পূর্ণ হওয়ায় বাকীগুলি অপর এক খণ্ডে পৃথক্ গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

সাময়িক পত্রে সমালোচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পত্রসম্পাদক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ আমাদের সম্পাদন-রীতির যে বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছেন, সূচী প্রভৃতি সংযোজন করিয়া তাহা যথাসম্ভব সম্পূরণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার হৃদয়নিঃসৃত উপলব্ধির কথা জিজ্ঞাসুহৃদয়ে পবিত্র শান্তিবারি সিঞ্চন করে, গ্রন্থে তাঁহার নাম কিংবা প্রতিকৃতিপ্রকাশের অনুমতি ও অধিকার আমাদের না থাকায় এই অভিযোগের আর প্রতীকার কিছুতেই সম্ভব হইল না। আমাদের "সন্ন্যাসী দাদা" এইভাবে সাধারণে ধরা দিতে প্রস্তুত নহেন।

চিঠিগুলি যাঁহাদের উদ্দেশে লিখিত, তাঁহারা পরস্পরে নকল করিয়া উহা নিজের নিজের কাছে রাখিতে যত্ন করিতেন; সেই বন্ধুগণের সাহায্যের জন্যই এগুলির মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অপর কেহ ইহা পড়িয়া তৃপ্তি ও আনন্দ পাইলে আমাদের শ্রম অধিকতর সফল জ্ঞান করিব।

বিনীত

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

দশহরা, ১৩৩৮

২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,

কলিকাতা।

সূচীপত্র

তত্ত্বকথা

তত্ত্ব

জগতে দুইটি দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়—সাংখ্য যাহাকে বলেন পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্ত যাহাকে বলেন ব্রহ্ম ও মায়া। সাধারণ লোক ইহাকে দেহী ও দেহ-শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। ব্রহ্ম আপন প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত হইয়া আছেন; জগৎ—আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহার সবই যে পুরুষ-প্রকৃতির সেই আদি দম্পতীর শিব-দুর্গার যুগল মূরতি। মূল প্রকৃতি পুরুষসান্নিধ্যে মহৎ অহঙ্কার তন্মাত্র আদিরূপে পরিণত হইলেন, পুরুষ-চৈতন্যও সেই প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পুরুষ-চৈতন্য ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব ভিন্ন-ভিন্নরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কোন্ স্তরে পুরুষ-চৈতন্য কিভাবে অনুভূত হন, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে থাকিয়া আমাদের শ্রীভগবান কিভাবে লীলা করেন, কোথায় তিনি কিভাবে বর্ত্তমান কিভাবে লীলাতৎপর, তাহা লইয়াই

তো আমাদের তত্ত্বকথা। তিনি মাতাপিতার ভিতরে স্বামীস্ত্রীর ভিতরে ছেলেমেয়েদের ভিতরে আকাশে সমুদ্রে ফলে ফুলে অনলে অনিলে কিভাবে অনুমিত অনুভূত দৃষ্ট ও আস্বাদ্য, তৎসম্বন্ধে ঋষিদের উক্তি সাধকদের অনুভূতিই আমাদের অবলম্বনীয়।

প্রকৃতির স্তর অনন্ত, সুতরাং তত্ত্বও অনন্তভাগে বিভক্ত; কিন্তু তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বিভাগগুলি লইয়া আমরা তত্ত্বকে তত্ত্ব-জ্ঞানকে প্রধানতঃ কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। বাহিরের ভাবটা লইয়া দেহতত্ত্ব এবং ভিতরের ভাবগুলি লইয়া আত্মতত্ত্বই আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আমরা যে কোন দিকেই চাইনা কেন, সর্ব্বপ্রথমে ব্যষ্টিভাবে একটা স্থূলদেহ আর সমষ্টিভাবে একটা স্থূল জগৎই যেন আমাদের নজরে পড়ে। শরীরগুলি পরিবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি যেন লোপ পায় অদৃশ্য হয় আর কতকগুলি সূক্ষ্মাকারে থাকিয়া যায়। বীজ আপন দেহ বিদীর্ণ করিয়া গাছে পরিণত হয়, গাছ কালে মরিয়া যায়; তাহার অনেক-খানি অংশ পরমাণুতে লয় হয়, তবুও সে কতকগুলি বীজ রাখিয়া যায় যাহা হইতে আবার অনেকগুলি গাছ জন্মে। প্রত্যেক বীজের মধ্যেও আমরা দুইটি জিনিস দেখিতে পাই, একটা বীজের দেহ আর একটা সেই বীজের আত্মা; দেহ অবলম্বনে তাহার ভিতরের আত্মাটি যেন আপন মহিমা বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। এই ভিতর-বাহিরের

ব্যাপারটিকে শক্তি ও ভূত, motion and matter, দেবতা ও বাহন, আত্মা ও দেহ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই ভিতরের ভাবগুলি লইয়া, আত্মভাব বা পরমার্থ-তত্ত্ব লইয়া যাহা কিছু তাহার নাম আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্ব ; আর বাহিরের ভাবগুলি লইয়া, স্থূল দেহটি লইয়া যাহা কিছু তাহার নাম আধিভৌতিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক তত্ত্ব। সুতরাং তত্ত্বকে আমরা ভিতর-বাহির, কারণ-কার্য্য, আত্মা ও দেহ, পারমার্থিক ও দৈহিক এই দুই-ভাবে বিভক্ত করিতে পারি।

আদর্শ জীবনে আদর্শ ধর্ম্মে আমরা এই ভিতর-বাহিরের মধ্যে কেমন সুন্দর একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বেদ কোরাণ বাইবেল আদি ধর্ম্মশাস্ত্র ভিতরের এই পারমার্থিক তত্ত্ব লইয়া তাহারই আলোচনায় তন্ময়, আর বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্র বাহিরের ব্যবহারিক তত্ত্ব লইয়া একটু বেশী ব্যস্ত। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" যাহা অজ্ঞাত যাহা সকলে জানে না যেদিকে সাধারণের দৃষ্টি নাই অথচ যে দিকটা একান্তভাবে আবশ্যক, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রকৃত তত্ত্ব কিন্তু এই উভয়কে লইয়া। আমাদের একদিকে আত্মা আর একদিকে স্থূলদেহ, এই উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে আমাদের মন। সেই মনকে লইয়া তাহারই তত্ত্বালোচনায় নিরত রহিয়াছে আমাদের দর্শনশাস্ত্র। এই মন বা চিত্ত যেন একহাতে আত্মা ও অপর হাতে বিষয় লইয়া

ভগবৎলীলা-রহস্য প্রচারে তন্ময়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রও সেইজন্য একদিকে আত্মা অপর দিকে দেহ, এই উভয়ের ভিতরকার মানসিক ভাব ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের তত্ত্বালোচনায় তৎপর। আমাদের সব কাজ চলিতেছে এই উভয়ের মিলন হইতে। জগতে এমন একটা পরমাণু এমন একটা ভাব আসিতে পারেনা কল্পনা করা যায় না, যেখানে এই উভয় তত্ত্ব বর্ত্তমান নাই। পুরুষ ছাড়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ যে আমাদের ধারণার অতীত কল্পনারও অতীত। প্রকৃত তত্ত্ব রহিয়াছে এই উভয়ের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ে; অথচ আমরা ইহার একদিকে বেশী জোর দিতে গিয়া অন্যদিকে অনেকটা উদাসীন হইয়া সমন্বয়ের আসল তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া পদে পদে বঞ্চিত হইতেছি, আমাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনে আনন্দলাভে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। প্রায় সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র সাধনগ্রন্থ এই উভয় দিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়া প্রায় সব কথায় সব বর্ণনায় উভয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেও কতকগুলি কথা যে শুধু বাহিরের ভাব অবলম্বনে আর কতকগুলি যে শুধু ভিতরের ভাব অবলম্বনে লিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে নিত্য ভাবগুলি দেখান হইয়াছে তাহা আত্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া আর যেখানে অনিত্য ভাব দেখান হইয়াছে তাহা যে দেহকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এই সকল কথার মধ্যে

এই নিত্য ও অনিত্য তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য খুঁজিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

তার পরে ঋষিদের কথাগুলির মধ্যে যেমন একটা সুন্দর স্বাভাবিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী লেখকদের ভিতরে সেই ভাবটা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় না; যেখানে লেখকের মনে সামঞ্জস্য ছিলনা সেখানে ব্যাখ্যাকর্ত্তা যদি জোর করিয়া একটা সামঞ্জস্য প্রমাণ করিতে যান, তাহা হইলেও সেখানে সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা পালন করা হইয়াছে বলা যায় না। এইজন্য সকল ধর্ম্মে কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা শুধু আধ্যাত্মিক আর কতকগুলি ব্যবহারিক তত্ত্ব আছে যাহা শুধু সামাজিক ও দৈহিক। ভিতরে এমন কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, আর বাহিরে এমন কতকগুলি ভাব প্রকাশ পায় যাহা এতটা বিকৃত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহার মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করা কঠিন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, সকল ব্যাপারের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে যাওয়া যেমন অসঙ্গত, তেমনি সব ব্যাপার হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ দিয়া শুধু একটা আধিভৌতিক ভাব লইয়া ব্যস্ত থাকাও অসঙ্গত। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবের নাম শুনিয়া ব্যথিত হন, তাঁহাদের একবার বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের, দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকার শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি সাধক পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায়

দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। বিশেষতঃ দেবতাতত্ত্ব সাধন-তত্ত্বের ভিতর দিয়া উঁহাদের অনেকেই একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্করণে সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ভাবগুলি বাদ দিয়া কেবল বাহিরের ভাবগুলি ধরিতে গেলে যে কত বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, প্রায় সকল ধর্ম্মমতের সকল সাধন-প্রণালীর ভিতরেই কতকগুলি অমূল্য সাধনতত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। কালের প্রভাবে উপযুক্ত সাধকের অভাবে স্বার্থ-পরতার স্বভাবে সেগুলি আস্তে আস্তে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে। এখন আমরা যদি কাহারও একটু বিকৃত ভাব দেখিয়া কিংবা নিজের বুদ্ধির দোষে তাঁহাদের সাধন-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করি, তবে আমরা নিজেরা যে সেই সব তত্ত্ব আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেককে বঞ্চিত করিতে আরম্ভ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক সভ্যসম্প্রদায় এইভাবে তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনেক উন্নত সাধন-তত্ত্বাস্বাদনে যে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এইজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালীর আচার-ব্যবহারের কতকগুলি সামান্য কথা লইয়া তাহার মধ্যে কোনও সাধন-তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে কিনা, সে বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। আমাদের

আলোচনার ভিতরে অনেক ভুল থাকিলেও এইভাবের আলোচনার ফলে যদি ভবিষ্যতে কোনও প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্করণে সুবিধা হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রায় সকল দেশের সাধনপ্রণালী লইয়া বিচার করিলে তাহার মধ্যে বেশ একটী সুন্দর সুসাদৃশ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা দ্বারা সুন্দর সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মানুষ ভিতর-বাহিরের সব তত্ত্বগুলির মধ্যে যথাসম্ভব একটী সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ণ পরিণতিলাভে সমর্থ হয়, তাহাকে সকলে সাধনা বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন (It is the easiest best and most natural method of realising perfection—realising God.)। ভগবৎতত্ত্ব—পূর্ণতত্ত্ব, সাধনা সেই পূর্ণতত্ত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রকৃত সাধন-তত্ত্ব জানিতে পারিলে, এমন কি অবিশ্বাসী নাস্তিকগণও আসিয়া তাহাদের অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য—বাঞ্ছিত সিদ্ধি-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রলোভিত হইবে। এই যে ঈশ্বর-শব্দ একটা অদ্ভুতভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সাধন-তত্ত্ব একটা অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার করিতেছে, যোগ আদি শব্দগুলি ব্যাধি দূর না করিয়া একটা আগন্তুক ব্যাধির ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—সাধনার রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিলে

আর সাংসারিক সুখভোগ হইবে না, সংসার হইতে দূরে গিয়া আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া নিজে বঞ্চিত হইয়া সকলের কষ্টের কারণ হইতে হইবে,—সাধন সম্বন্ধে এই বিকৃত ভাবগুলি সমাজ হইতে দেশ হইতে সাধন-তন্ত্রের ভিতর হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। বেদের সাধন-তত্ত্ব আনন্দলাভের উপায়গুলি কালের প্রভাবে বিকৃত ও ভীষণভাব ধারণ করিয়া দেশের যে মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছে, তাহার হাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইবে। যে মা আমাদের পরম-কল্যাণময়ী দয়াময়ী প্রেমময়ী আনন্দময়ী তাঁহাকে বুদ্ধির দোষে ভুল বুঝিয়া পরের কথায় বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করিব, যে বাবা আমাদের আনন্দময় শিব পরম মঙ্গলময় তাঁহাকে একজন নেশাখোর অপদার্থ ভাবিয়া ত্যাগ করিব, যে ভগবান পরম রসিক-শেখর মদনমোহন যোগেশ্বর ঈশ্বর তাঁহাকে লোকের কথায় বিকারগ্রস্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, এ যে পরম পরিতাপের কথা!

সাধন-তন্ত্রের ভিতর হইতে সব রহস্যগুলির যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে ভগবান কিরূপ কল্যাণের আনন্দের শান্তির প্রস্রবণ, সাধক কিভাবে নিজের ও আত্মীয়স্বজনের কল্যাণসাধনে প্রীতিবিধানে সমর্থ হন, সাধক কেমনভাবে সেই অনন্ত সুন্দরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া

সমস্ত জগৎকে সমস্ত জীবকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করেন। দেখাইতে হইবে প্রকৃত সাধক যেভাবে দর্শন করেন, অসাধক সেভাবে দর্শন করিতে জানেন না। প্রকৃত সাধক যেভাবে ভোগ করিতে পারেন, অসাধক কিছুতেই সেইভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হন না। ধনজন বিদ্যাবুদ্ধি সুখশান্তি ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য ও আনন্দভোগের প্রধান সহায় সাধনা। ধনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবী সাধকের আরাধ্যা, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীও সাধকের পূজ্যা; দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, সিদ্ধিদাতা গণেশ, আনন্দময় মহাদেব, সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, মুক্ত বুদ্ধ, প্রেমিক যীশু, বীর মহম্মদ ইত্যাদি সকলেই উপযুক্ত সাধকের সাহায্য করিবার জন্য আনন্দবিধানের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। ভগবৎতত্ত্ব সাধনরহস্য এমন সুন্দর জিনিস, যাহার লোভে জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক প্রেমিক একান্তভাবে লুব্ধ হইয়া সাধনা-দেবীর কাছে ছুটিয়া আসিবেন।

তান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক কৃষ্ণ

* * ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি, প্রাণ ও রয়ি, অন্নাদ ও অন্ন এই দ্বিবিধ তত্ত্ব সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই আমরা ভিতর-বাহির, তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক (history-allegory) সূক্ষ্ম-স্থূল, মানসিক ও দৈহিক এই দুই দিক লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। বাহিরটা যেন ভিতরকে প্রকাশ করে, উহা যেন ভিতরের একটা প্রকাশক যন্ত্র-বিশেষ। সৃষ্টিলীলার মধ্যে আমরা দুইটি তত্ত্ব দেখিতে পাই—একটী আবরণাত্মক অন্যটী প্রকাশাত্মক, একটী ঢাকা অন্যটী খোলা, একটী ছাড়া অন্যটী ধরা, একটী দূরে যাওয়া অন্যটী কাছে আসা, একটী তিরোভাব অন্যটী আবির্ভাব, একটী বিরহ অন্যটী মিলন। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া একবার তাহার মধ্যে লুকাইলেন আর একবার সৃষ্ট তত্ত্বগুলি ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইলেন। বৈষ্ণব সাধক-গণ শ্রীকৃষ্ণের লুকোচুরি-খেলার মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয় তত্ত্বই

ভগবানকে লইয়া ভগবানকে আস্বাদ করিবার জন্য; এ কারণ ইহা সিদ্ধ-মহাত্মাদের আত্মারাম মুনিগণের পর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

সব অবস্থার মধ্যে তাঁহার লীলারহস্য অনুভবে আইসে না বলিয়া, সব তত্ত্বে তাঁহার অস্তিত্ব কার্য্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বলিয়া জ্ঞানী ভক্ত সাধকগণ একবার 'নেতি-নেতি' সাধনার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি দেখিয়া লইবার জন্য এত ব্যস্ত হন। একবার সেখানে পৌঁছিলে একবার তাঁহাকে পাইলে তখন সর্ব্বত্রই যে তিনি, সব অবস্থায় সব তত্ত্বে সব কাজে তাঁহারই লীলা; তখন মিলন মধুর, বিরহ মধুর, পাওয়া মধুর, খোঁজা মধুর, নির্গুণ মধুর, সগুণ মধুর, লয় মধুর, সৃষ্টি মধুর, মরণ মধুর, জীবন মধুর, প্রকাশ মধুর, আবরণ মধুর—তখন যে রসরাজ্যের সবই মধুর! যত গোলমাল তাঁহাকে পাওয়ার আগে, তাহাও নাকি খোঁজাকে পাওয়াকে মধুর করিবার জন্য—সব তত্ত্বে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য। দুধটা হজম হয়না বলিয়াই তাহাতে জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইতে হয়, সূর্য্যকে ঠিক ভাবে দেখিবার অধিকার না হওয়া পর্য্যন্তই কাচে কালি মাখাইয়া সূর্য্য দেখিতে হয়, পূর্ণ প্রেম ধারণার অতীত বলিয়াই তো শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবাপন্ন জীবের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ করাইতে হয়। নিত্য-সিদ্ধাবস্থায় স্বধামের পূর্ণানন্দানুভূতি যে কি অপূর্ব্ব জিনিস

অপূর্ব্ব তত্ত্ব, সিদ্ধ ও সাধক ভক্তদিগকে তাহার একটা আভাস দেওয়ার জন্যই তো শ্রীভগবানের অবতার-তত্ত্ব, নৈমিত্তিক লীলারহস্য। সেখানে আমরা ভিতর-বাহিরের বেশ একটা সুন্দর পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাই (clearest and perfect harmony of the inner and outer side); সেখানে যন্ত্রটি যেন আর যন্ত্রীর প্রকাশে মোটেই বাধা দেয় না—দেহ সেখানে দেহীকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। সেখানে ঈশ্বরভাব ও জীবভাবের ভেদ যেন দূর হইয়া যায়—এই উভয় ভাবের অনেকটা পূর্ণ মিলন পূর্ণ সমন্বয় উপলব্ধি করা যায়। সেই প্রকাশ-ভূমির নাম বৃন্দাবন কৈলাস অযোধ্যা বা স্বর্গধাম, যিনি প্রকাশ পান তাঁহাকে তাত্ত্বিক কৃষ্ণ শিব রাম যীশু আদি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সেখানে যেন নিত্য-নৈমিত্তিকের ভেদভাব অনেকটা দূর হইয়া যায়—নিত্য-নৈমিত্তিকের মিলনে মর্ত্তধাম স্বর্গরাজ্যে ভগবৎধামে পরিণত হইয়া পড়ে।

যিনি এই তত্ত্ব দেখাইতে আসেন তাঁহার ভিতরে যেন আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক, বীজ ও গাছ, ভিতর ও বাহির, নিত্য ও নৈমিত্তিক-লীলার বেশ সুন্দর এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি পূর্ণভাবে সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি ছাড়া অন্যে যে তাহা দেখিতে শুনিতে বুঝিতে আস্বাদ করিতে বর্ণনা করিতে

প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। দ্রষ্টাদিগের মধ্যে আপন আপন অধিকার অনুসারে কেহ দেখে তাঁহার স্থূল দেহটি, কেহ তাঁহার প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আত্মা; সেই দেখার মধ্যেও আবার আংশিক ও পূর্ণভাবে দেখার দিক দিয়া ভেদভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন চোখ দেখে রূপ, কান শুনে শব্দ, নাক আঘ্রাণ করে গন্ধ, হাত বোধ করে স্পর্শ, মন অনুভব করে সংস্কার, বিজ্ঞান দেখে চিৎবিভূতি, আত্মা উপলব্ধি করে স্বরূপ। আবার এই দেখা শুনা অনুভব করার ভিতরেও সিদ্ধ সাধক ও অসাধকের দিক্ দিয়া অনেকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে যেমন দেখে যে যেমন অনুভব করে, সে তদ্রূপ লিখিতে বর্ণনা করিতে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; এই বর্ণনায় সাধকের অনুভূতি প্রকাশ করিবার শক্তি ও ভাষাজ্ঞানের দিক্ দিয়া বেশ একটা তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বর্ণনাকে ভুল বলা উচিত নহে, সকলের বর্ণনাই আংশিক ভাবে ঠিক; এবং যিনি পূর্ণভাবে দেখিতে অনুভব করিতে ও বর্ণনা করিতে পারেন, তাঁহার বর্ণনাই শুধু পূর্ণভাবে ঠিক হইতে পারে—যদি পূর্ণভাবে দেখা অনুভব করা বিশেষতঃ ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর হয়। হস্তিদর্শন ন্যায়ের মত সকলের দেখা অনুভব করা বর্ণনা করা পূর্ণভাবে সাধিত হইলে যে সমুদিত জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই অনেকটা ভগবৎতত্ত্ব নামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ভগবৎজ্ঞান ভগবৎপ্রেম ভগবৎআনন্দের অর্থই যে, যে কোনও জ্ঞান যে

কোনও প্রেম যে কোনও আনন্দের পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ত অবস্থাবিশেষ (Knowledge of God, love of God, happiness of God is equal to any knowledge love or happiness raised to the power infinity.)। এই পূর্ণ পরিণতিলাভের ভিতর যে তাহার পূর্ণ পরিণত সমষ্টিরূপপ্রাপ্তি একান্ত আবশ্যক, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত জগতের পূর্ণ জ্ঞান না হইলে একটা পরমাণুরও পূর্ণজ্ঞান অসম্ভব ; আবার একটা পরমাণুরও পূর্ণজ্ঞানকে বাদ দিয়া জগতের ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞানলাভ অসম্ভব—ব্যষ্টি-সমষ্টি এমন সুন্দরভাবে সম্বদ্ধ, এমন আশ্চর্য্য সুকৌশলে বিধৃত! একটী মানুষের মধ্যে একটা গাছের মধ্যে একটা পরমাণুর মধ্যে স্থূল দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বই বর্ত্তমান ; সুতরাং আত্মা পর্য্যন্ত পরমাত্মা পর্য্যন্ত না জানা হইলে যে পূর্ণভাবে জানাই হইল না। "একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" যে এককে ভাল করিয়া জানিয়াছে তার যে সব জানা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পূর্ণ অবতারের জীবনে ভিতরে বাহিরে আত্মায় ও দেহে অনেকটা সুন্দর সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকাই স্বাভাবিক। যে যত অপূর্ণ তাহার ভিতরে এই সাদৃশ্য তত অল্প লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ পরিণত জীবনরূপে অনুভব করিতে বর্ণনা করিতে গিয়া একটা ভয়ানক অসমঞ্জস ভাব আনিয়া ফেলি, আমাদের অনুভূতির ও বর্ণনাশক্তির অপূর্ণতা আসিয়া এই বর্ণনাটীকে আরও বিকৃত

বিসদৃশ ও সময় সময় কলঙ্কিত করিয়া তোলে। সাধারণ লোকে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশুর অবতার সাজিতে গিয়া অবতার-রূপে বর্ণিত হইতে বসিয়া যে সাধারণের চোখে ঐ সকল আদর্শ অবতারগুলিকে কতকটা বিকৃত মলিনীকৃত করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণ্ডারা স্বার্থের জন্য দশটি জায়গাকে যখন সতীর দেহত্যাগের স্থান বলিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, তখন যে প্রকৃত সতীকুণ্ড নির্দ্ধারণ করা বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে; ফলে অনেকে তীর্থসম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। তারপরে সাধারণ লোকদের জীবনই যখন অতি-রঞ্জিত করিয়া আদর্শ জীবনের সদৃশ করিয়া তোলা হয়, তখন প্রকৃত আদর্শ জীবনগুলিও যে প্রাচীন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অতি-রঞ্জিত হয় নাই, তাহাও কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। পূর্ণ আদর্শজীবনে অবতার বা অবতারকল্প মহাত্মাদের জীবনে ভিতর-বাহিরের বেশ একটা সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেও সব বিষয়ে ভিতর-বাহিরের সামঞ্জস্য রাখা সামঞ্জস্য দেখান তত সহজ নয়। ভিতরের দিকটা, মানসিক বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ভাবগুলি আত্মার অনেকটা নিকটবর্ত্তী আত্মভাবে ভাবিত বলিয়া অনেকাংশে অসীম, বাহিরের দিকটা ইহার ঠিক বিপরীত বলিয়া অনেকটা সসীম। মনের গতি দেহের গতি অপেক্ষা অনেকটা তীব্রতর। ভাবনার মধ্য দিয়া মন যত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারে, দেহকে ততটা তাড়াতাড়ি

লইয়া যাওয়া সব সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না, মনে যেরূপ ভাবা যায়, কাজে তাহা ততটা ফুটাইয়া বাহির করিয়া সফল করিয়া তোলা তত সহজ নহে। প্রাচীন ঋষিরা এই ভিতর-বাহিরের সামঞ্জস্য যাহাতে ঠিক থাকে সেদিকে বেশী দৃষ্টি দিতেন, তাঁহাদের কথাগুলি সত্য ছাড়িয়া অনুভূতি ছাড়িয়া বেশী দূর অগ্রসর হইত না—জ্ঞানটা অনেককাংশে সাধনা দ্বারা সংযত সফলীকৃত করা হইত। ব্রহ্ম যেমন ভিতরে বাহিরে নির্গুণে সগুণে পূর্ণ সমন্বয়ে বর্ত্তমান—যে যতটা উন্নত তাহার নিকট ততটা সমন্বয় অনুভূত হয়—প্রকৃত সাধকজীবনে বিশেষতঃ সিদ্ধ-মহাত্মাদের জীবনেও তদ্রূপ অনেকটা ভিতরে বাহিরে সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ জীবনে, এমন কি অবতারদের জীবনেও অস্বাভাবিকভাবে কোন সামঞ্জস্য দেখাইতে গিয়া, অনেক সময় অপূর্ণ মানবকে পূর্ণ-ভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া, বিশেষতঃ অসিদ্ধ স্থূলদর্শী পণ্ডিত লেখকগণ একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে গিয়া তাত্ত্বিক ভাবকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রচার করিতে গিয়া একটা ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। তাত্ত্বিক কৃষ্ণতত্ত্বের সব বিষয়গুলি ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনে পূর্ণভাবে বিকশিত দেখাইতে গিয়া সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধ তত্ত্বগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে ভাষার মধ্য দিয়া প্রচার করিতে গিয়া অনেক সময় হয় তাত্ত্বিক জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া বসিয়াছেন, অথবা ঐতিহাসিক জীবনকে অতিরঞ্জিত করিতে গিয়া

এই যুগে চৈতন্যকে, এমন কি সম্প্রদায়বিশেষের স্থাপন-কর্ত্তাদেরে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করিতে প্রমাণিত করিতে গিয়া সময় সময় সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা উপহাসাস্পদ হইতেও ত্রুটি করেন নাই। চৈতন্যের, সাধক-বিশেষের গোচারণ কালীয়দমন গোবর্দ্ধনধারণ দোল রাস আদি লীলাঅভিনয় তাহার সাক্ষী। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এইরূপ একটা তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভাবগত বিবরণ দেখতে পাই। কোন্ জায়গায় তাত্ত্বিক কোথায় বা ঐতিহাসিক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা সব সময় ততটা ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। তাত্ত্বিক নারদ সর্ব্বযুগে বর্ত্তমান। দক্ষযজ্ঞে সব দেবতাদিগকে ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে তিনি ব্যস্ত। পার্ব্বতীর বিবাহে তিনি ঘটক। কংসবধের জন্য তিনি কৃষ্ণকে উত্তেজিত করেন। বেদোক্ত অসুরবধে তিনি দেবতাদের সহায়। ধ্রুবের তিনি গুরু। রামায়ণে মহাভারতে ও ভাগবতে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি। স্বর্গ ও মর্ত্তধামের মধ্যে তিনি একজন দূতের কাজ করিতে চিরদিনই তৎপর। তিনি ঠিক যেন বাইবেলের স্বর্গীয় দূত (Holy Ghost)। নারদ যেন সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে বর্ত্তমান, তিনি যেন বাস্তবিকই অমর; যদিও ঐতিহাসিক নারদের মর্ত্তলীলা যুগবিশেষে সময়বিশেষ কতকটা সীমাবদ্ধ। জাম্ববান্ হনুমান বিভীষণ আদি কেন কিভাবে অমর, তাহাও

চিন্তনীয়। তাত্ত্বিকভাবে তাঁহারা নিত্যলীলার সহায়। নৈমিত্তিক লীলায় তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া অবতারের লীলায় সাহায্য করিয়া অবতারদের ন্যায় আবার অন্তর্হিত হন। ইহা ছাড়া অবতারদের এবং এইসব পার্ষদদের আবেশভাবও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির-দেহে বিদুরাদিরও আবেশের উল্লেখ আছে। চৈতন্য-দেবে নৃসিংহের রামের বলরামের রাধারাণীর ও কৃষ্ণের ভাবাবেশ বৈষ্ণব গ্রন্থের একটা প্রধান রহস্য। বলা বাহুল্য, এই আবেশ ও অবতারভাবকে আজকাল অনেকে নকল করিতে গিয়া বহু প্রকার অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলায় অখিলাত্মভূত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়রূপ গরুগুলিকে (গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি) লইয়া লীলাতৎপর থাকিলেও ঐতিহাসিকভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে আজও স্থূলে গোচারণ করিবেন, সে কথা জোর করিয়া বলা ততদূর সহজও নহে সঙ্গতও নহে। আজ চৈতন্যদেব পুনরায় আবির্ভূত হইলে হয়তো দেশের দুর্ভিক্ষের কথা অনুভব করিয়া স্মরণ করিয়া বৈষ্ণব ভিক্ষুকদিগকে জীবসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতেন।

বেদের অঘ—পাপের সংস্কার যে মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া আকাশের সূক্ষ্মতত্ত্বে অবস্থিত ভিতরকার সূর্য্যচন্দ্রকে—আত্মা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া মানুষকে কুপথগামী করে, তাহাতে সন্দেহ নাই;

কিন্তু তাই বলিয়া মূর্ত্তিমান পাপরূপী জন্তুবিশেষ যে এই স্থূল চন্দ্রসূর্য্যের গতি রোধ করিয়া বসিবে, একথা বিশ্বাস করা যে তত সহজ নহে। কামরূপী পুতুনা দেহরাজ্যে তাহার অসীম প্রভাব দেখাইবার জন্য চৌরাশি হাজার যোজন দেহের প্রতি তত্ত্বে ব্যাপ্ত থাকিয়া জগতে অপ্রতিহত প্রভাব দেখাইতে সমর্থ হইলেও পুতুনাকল্প সামান্য এক-জন নারী বা একটি জন্তু যে মৃত্যুকালে অত হাজার যোজন-ব্যাপী দেহ বিস্তার করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অনেকটা কারণ আছে। পাপরূপ অসুরগণের সূক্ষ্মভাবের ক্ষমতা যতটা অসীম মনে হয়, পাপাচারী দস্যুদের স্থূলভাবে অত্যাচারের পরিমাণটা সব সময় ততটা বেশী বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সাধক ভক্ত দুইটি বালকবালিকা, দুইটি পাখী বা দুইটি ডাল অবলম্বন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অনুভব করিতে করিতে ভাবের রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে এতদূর চলিয়া যান বা যাইতে সমর্থ হন যে, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সেই সব বর্ণনা ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনে পূর্ণভাবে প্রমাণীকৃত করিতে গিয়া রাধাকৃষ্ণকে সময় সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, এমন কি বিকৃতভাবে হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিতে পারেন। তাত্ত্বিক রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহাত্মক লীলা নিত্যকালস্থায়ী হইলেও ঐতিহাসিক কৃষ্ণ ও গোপী-ঘটিত প্রীতির অভিনয় যে শ্রীকৃষ্ণজীবনের দশ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে

সন্দেহ করার উপায় নাই। ব্যবহারিক কৃষ্ণজীবনে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে গোপীসন্নিধানে সদা বর্ত্তমান বলিয়া প্রমাণ করিতে গেলে যে, ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়াতত্ত্বের সাংখ্যোক্ত পুরুষপ্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ পরিণতি দেখাইতে গিয়াই তো ঐতিহাসিক আদর্শ পূর্ণপবিত্র কৃষ্ণচরিত্রে দোষারোপ করিবার এতটা সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষ-চৈতন্য প্রকৃতির প্রতিতত্ত্বে লীলা-তৎপর, তাই পুরুষাবতার ঐতিহাসিক কৃষ্ণচন্দ্রও সমস্ত গোপী লইয়া সমস্ত প্রকৃতি লইয়া পূর্ণ অবাধিতভাবে লীলারত; এইভাবের বর্ণনাই তো আজ পবিত্র কৃষ্ণজীবনকে এতটা বিকৃতভাবে ভাবিবার ও বর্ণনা করিবার সুযোগ দিয়াছে। তাত্ত্বিক কৃষ্ণচরিত্রের সমস্ত রহস্যগুলি ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-জীবনে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান দেখাইতে গিয়া, কৃষ্ণচরিত্রকে অযথাভাবে ধ্যান করিতে গিয়াই আমরা সমাজকে বিকৃত করিয়া তুলি, কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শভাব সাধনরহস্যগুলিকে তুচ্ছ করিতে গিয়া নিজেরাও বঞ্চিত হইয়া পড়ি। বোধ হয় বঙ্কিমবাবু এইজন্যই তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' কতকগুলি রহস্যকে অতি সত্যভাবে গ্রহণ করিয়া, আর কতকগুলিকে বাদ দিয়া একটি আদর্শ ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবন বাহির করিতে এতটা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ব্যবহারিক কৃষ্ণজীবন যেমন সত্য, তাত্ত্বিক কৃষ্ণ-রহস্যও ঠিক তেমনি সত্য। পার-

মার্থিক কৃষ্ণতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনপ্রণালী মথুরাধামে কৃষ্ণাবতারের বহুপূর্ব্বেও ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল; এমন কি, বেদের ভিতরেও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকাল রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ—এমন কি, যীশুখৃষ্টকেও লইয়া নানাবিধ গবেষণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের সম্বন্ধে যৌগিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখিয়া অনেকে অস্থির হইয়া পড়িয়া সমস্ত জিনিসটাকেই অগ্রাহ্য করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছেন। গীতাদি গ্রন্থসম্বন্ধেও এইজাতীয় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, এইজাতীয় সমস্ত গবেষণা ও ব্যাখ্যার মূলেই কতকটা সত্য নিহিত আছে; কিন্তু সমস্ত বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন-স্পৃহা ও বিদ্বেষভাবের বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া যেখানে ইহাদের মিলন ও পরিণতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা আসল তত্ত্ব রহিয়াছে সেইখানে। ইহাদের মধ্যে একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা, একের ভাব দিয়া অন্যকে সীমাবদ্ধ বা অতিরঞ্জিত করিবার প্রবৃত্তিই যত অনর্থের কারণ। মনে করুন, আমার ভিতরে স্থূল দেহ প্রাণমন ও আত্মা রহিয়াছে; এখন আমার কোনও বন্ধু যদি আমার এই স্থূল দেহ ও তাহার উৎপত্তি পরিণতি বিপরিণতি ও লয় অবলম্বনে আমার একটা প্রকৃত ইতিহাস লেখেন, তবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। আর একজন যদি আমার প্রাণতত্ত্ব লইয়া মৌলিক বিবরণ, মনস্তত্ত্ব ও

আত্মতত্ত্ব লইয়া কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিকাশ দেখাইতে যান, তবে তাহাও অসত্য বলিয়া অস্বীকার করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। ইহার মধ্যে যাহার বর্ণনা প্রকৃত সত্যকে যতটুকু অতিক্রম করিয়া চলিবে, তাহারই বিবরণ ততটুকু দূষণীয় বলিয়া ত্যাজ্য হইবার যোগ্য। প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে আমরা ভিতর ও বাহির, ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক —উভয়ই বর্ত্তমান দেখিতে পাই; উভয় ভাবের যথাসম্ভব পরিণতি দেখাইতে গেলে আর কোনও গোলযোগ থাকেনা। একটাকে সীমাবদ্ধ করিতে গিয়া, একটায় সীমাবদ্ধ হইতে গিয়া কিংবা উভয়ের একটা অস্বাভাবিক ভাবে সমন্বয় দেখাইতে গিয়া, স্বাভাবিক সমন্বয়-ভাবকে অস্বীকার করিতে গিয়াই আমরা হয়তো অতিরঞ্জনের না হয় সংকীর্ণ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া বঞ্চিত হইয়া পড়ি। মনে রাখিতে হইবে, কোন্ জীবনে ভিতর-বাহিরের সমন্বয় কি পরিমাণে সম্ভবপর? আমরা যতই আদর্শ জীবনের কাছে পৌঁছিব, ততই এই সামঞ্জস্য সমধিক সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। যিনি উপযুক্ত লেখক তিনি সত্যকে প্রকৃত তত্ত্বকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। আদর্শ জীবনে সকল ভাবের সমন্বয় এবং সাধারণ জীবনে উহাদের পরস্পর বিরোধ দেখানই যে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

আত্মাকে যতটা উপলব্ধি করা যায়—মনে যতটা কল্পনা করা যায়, ভাষায় যে তাহাও ঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর

হয় না। তাই অনেক সময় আকারে ইঙ্গিতে ভিতরের অনেক রহস্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ভিতরের তত্ত্বগুলির সহিত বাহিরের তত্ত্বের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বাহিরের তত্ত্বগুলি অনেকটা অনুভববেদ্য সাধারণের ধারণার যোগ্য, তাই ভিতরের তত্ত্বগুলির কোন পরিচয় দিতে গেলে বাহিরের তত্ত্বগুলির এতটা সাহায্য লওয়া হয়। এজন্য বৈষ্ণব সাধক-কবিগণ প্রেমতত্ত্ব বোধগম্য করিয়া তুলিবার নিমিত্ত বর্ণনার সময় কামতত্ত্বের কতকটা সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন; তারপরে কাম ও প্রেমের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুরাণকার-গণ এইজন্যই সময় সময় অতিপ্রাকৃত হইতে—এমন কি, প্রকৃতিবিকৃতি হইতেও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কিভাবে তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, কিরূপে পুরাণ পড়িতে হইবে, পুরাণের কতটা গ্রাহ্য কতটা ত্যাজ্য অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য কোথায় কতটা যোগ করিতে বা কোথায় কতটা বাদ দিতে হইবে, সেজন্য ব্যাকরণ-অলঙ্কার,—এমন কি, পুরাণ স্মৃতি বেদ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সে সব না পড়িয়া সে তত্ত্ব না জানিয়া পুরাণাদি পড়িতে গিয়া বঞ্চিত হই, সেজন্য প্রাচীন ঋষিদেরে দায়ী করা সঙ্গত নহে। প্রাচীন ঋষিগণ বোধ হয় ভাবিতে পারেন নাই যে আমরা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিলাসিতার

উপকরণসংগ্রহের জন্য আমাদের মূল্যবান জীবনের অধিকাংশ এইভাবে ব্যয় করিব; দেশী ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে এইভাবে অবহেলা করিয়া সময় সময় বিদেশী পণ্ডিতদের সাহায্যে কখনও বা দেশী অসাধক অসমদর্শী পণ্ডিতনামধারী ব্যক্তিবিশেষের সাহায্যে প্রাচীন শাস্ত্রতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া উপযুক্তভাবে সংযত না হইয়া সাধনা না করিয়া ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের সাধনালব্ধ তত্ত্বগুলিকে বুঝিয়া লইয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া সমস্ত শাস্ত্রকে আপন ভ্রান্ত মতের পোষকভাবে প্রচার করিতে থাকিব। প্রাচীন ঋষিগণ যে আমাদের এই দুরবস্থার কথা একটুও অনুমান করেন নাই, তাহাও বলা চলে না। তাঁহারা যেভাবে কলিযুগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।

ভগবান জগৎজীব সৃষ্টি করিয়া বা জগৎজীবরূপে পরিণত বিবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত থাকিয়া সকলের ভিতর দিয়া আপন সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ অবাধিতভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে সচেষ্ট। জীব মাত্রই তাঁহার বিকাশের যন্ত্র বা মূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তি যত শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইবে প্রকাশও তত পূর্ণতা লাভ করিবে। মূর্ত্তি ত্রিবিধ দেহ যেখানে পূর্ণ স্বচ্ছ, সেখানে প্রকাশও যে অবতরণও যে পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ

নাই। সেই দেহগুলি এত স্বচ্ছ যে, তাহাকে অপ্রাকৃত দিব্য দেহ বলিলেই চলে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম সবই দিব্য অপার্থিব অলৌকিকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেখানে ভগবৎভাবের পূর্ণ বিকাশ সেখানে তিনি ফুটিয়া বাহির হইলেন বা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, তাহাতে ততটা আসে যায় না। সেখানে তাত্ত্বিক ভাব অবতারদের জীবনে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের ভিতরকার ভেদভাবটা যেন দূর করিয়া দেয়। যিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে ছিলেন, তিনিই যেন ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পড়িলেন। যিনি নিত্যলীলায় তাত্ত্বিক শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই যেন নৈমিত্তিক লীলায় ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়া থাকিলেন। এইভাবে রামচন্দ্র যীশু মহম্মদ আদি অবতারদের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক জীবন বিশেষভাবে আলোচ্য। ইহাদের সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক বর্ণনার সঙ্গে তাত্ত্বিক রহস্যগুলি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া সুন্দর ও কুৎসিতভাবে বর্ণিত ও গৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়া অমন সুন্দর জীবনগুলিকে যেন কেমন একটা কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন করিয়া সাধারণ বুদ্ধির অগম্য করিয়া তোলে।

হে আমাদের তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মা! আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমরা যে একান্তই তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার আপনা জন তোমার অতিপ্রিয়, তাহাতে

তো আর সন্দেহ নাই। তুমি যে আমাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা নিরত, আমাদিগকে সুখে শান্তিতে ও আনন্দে বিভোর করিয়া রাখাই যে তোমার স্বরূপ, ইহা যে ধ্রুব সত্য; কিন্তু আমরা যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া তত্ত্বকে বিকৃতভাবে কল্পনা করিয়া তোমার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার শাস্ত্রকে তোমার বিধানকে অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছি, তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। আমরা যে আমাদের বুদ্ধির দোষে সাধনার অভাবে আমাদের বাহিরের দেহটাকে আমাদের ভিতরের পরমার্থ-তত্ত্বের প্রকাশক না করিয়া অনেক সময় বরং আবরক করিয়া তুলিয়া ভিতরে বাহিরে একটা অস্বাভাবিক ভাব সৃষ্টিপূর্ব্বক উভয়কেই ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই; এবং একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া, এমন কি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া তোমাকে জানিতে তোমাকে চাহিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। তুমি না 'আবিঃ',—তুমি না প্রকাশস্বরূপ! তুমি না জানাইলে কেহই তো তোমাকে জানিতে পারে না, তুমি বরণ না করিলে কেহই তো তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, তুমি আমাদের অজ্ঞানতা মালিনতা স্বার্থ-

পরতা প্রভৃতি যাবতীয় ভেদ ভাব দূর কর। তোমার কৃপায় আমরা যেন তোমার পারমার্থিক তত্ত্ব ও তাহার অবতরণ—জীবের মধ্য দিয়া জীবের ভিতর দিয়া ঐতিহাসিকভাবে তাহার স্ফুরণ-রহস্য অবগত হইয়া তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার কাছে গিয়া তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া তোমার ধ্যানে বিভোর থাকিতে সমর্থ হই।

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের দিন। আবির্ভাব ও অবতার এই দুইভাবে ভগবানের জন্ম নিষ্পন্ন হয়—এক ভক্ত হৃদয়ে, দ্বিতীয় সাধারণ জন্মের ন্যায় জননীজঠরে। ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব সিদ্ধ-মহাত্মাগণ অনুভব করিয়া থাকেন। এখন মথুরাধামে দেবকীজঠরে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মলীলা একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাক। আজ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি; প্রকৃতির রাজ্যে জড়তার নাস্তিকতার তাণ্ডবনৃত্যে সাধুসজ্জন দেবতা-বৃন্দ ভয়ে তটস্থ। দেবকীর পরিণয়, কংসের আকাশবাণী-শ্রবণ, বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ, তাঁহাদের পুত্র-গণের কংসহস্তে নিধন আদি লীলা সকলেই জানেন। অন্তর্জগতে অহংতত্ত্ব এতদিন ভালমন্দ উভয় কাজেরই সহায় ছিল। দেবকী-বসুদেবের সাত্ত্বিক পরিণয়, সাধনের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোদয়ের সহায় হইয়া—এমন কি, তাহাদের চালক হইয়া রথে দেহরথে বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতির দিকে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল একটা আকাশ-বাণী, বুঝিতে পারিল ভবিষ্যৎটা কোন্ দিকে চলিতেছে; ভগবৎআবির্ভাবে অহংতত্ত্বের বিনাশ

অবশ্যম্ভাবী ; ভগবৎসান্নিধ্যে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় অহংতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব যে লোপ পায়, তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিল। 'অভিনিবেশ'রূপী কংস তখন নিজের অস্তিত্বটা বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সৃষ্টির রাজ্যে এসংসারে কেহ কি আর মরিতে ভালবাসে ? কংস তো আর লয়-যোগের সাধক নয়,—সে যে চায় ভোগ-বিলাস, সে যে চায় কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি। স্বার্থে আঘাত না লাগিলে সে কতকটা ভদ্রলোকের মত কাজ করিতে ভালবাসে, সাত্ত্বিক ভাবের সহায় হয় ; কিন্তু যখনই তাহার স্বার্থে আঘাত লাগিল, যখনই সে তাহার বিনাশের কথা শুনিল, অমনি তাহার রজোগুণ জাগ্রত হইয়া তমোগুণের সাহায্যে সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে জোর করিয়া দাবাইয়া দিয়া ভগবৎবিকাশে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িল। সাধুসজ্জনদিগের উপর আরম্ভ হইল অত্যাচার, ভুলিয়া গেল সে দয়ামায়ার কথা, জাগিয়া উঠিল হৃদয়মধ্যে তার হিংসাক্রোধের ভীষণা প্রবৃত্তি। বসুদেব-দেবকী সাধকসাধিকা ভগবৎভক্ত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন সংসারের কারাগারে, তাঁহাদের হাত-পা আবদ্ধ হইয়া পড়িল কামনা-বাসনার লৌহ-শৃঙ্খলে, নির্ম্মম ইন্দ্রিয়গুলি আরম্ভ করিল পাহারাওয়ালার কাজ করিতে।

সাধক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন সংসারে অহন্তা মমতা আদি ভাবগুলি কতরূপে কতভাবে সাধনরাজ্যে

বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। গোপনে লুকাইয়া নিভৃতে সাধন করিতে বসিলেও ইহারা আসিয়া পদে পদে বাধা দিতে আরম্ভ করে, চিত্তে নানাবিধ সংস্কার জাগাইয়া তুলিয়া সাধককে অস্থির করিয়া তোলে। সংসারের আত্মীয়স্বজন যখন মনে করেন যে ইহা দ্বারা আর সংসারের কাজ চলিবে না, তখন তাঁহারা যে কতভাবে সাধন-পথে বিঘ্ন আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহাও অনেক সাধক অবগত আছেন। এ সমস্তই কংসের অত্যাচারের অন্তর্গত। এদিকে যে সাধক একবার ভগবৎআনন্দ-রস আস্বাদ করিয়াছেন, ভগবৎপ্রাপ্তির তিলপ্রমাণ সামান্য বাধাও যে তাঁহার নিকট পর্ব্বত সমান মহা বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভগবৎবিরহ যে তখন নিমেষকে যুগ করিয়া তোলে। তাহার যে তখন আর কষ্টের সীমা থাকে না, চোখের জলের বিরাম হয় না—শ্রাবণের বর্ষাই বা কোথায় লাগে? সমস্ত জগৎ তখন শূন্যময় বোধ হইতে আরম্ভ করে। মহাপ্রভুর মহাবিরহভাবের কথা স্মরণ কর। কি অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন "যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে" তাহা একটু অনুভব করিতে চেষ্টা কর। ভিতর-বাহিরের যাবতীয় বিঘ্ন-গুলির মাঝে পড়িয়া সাধক তখন একান্তভাবে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করেন—তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন, উদ্ধারের জন্য মুক্তির জন্য ভগবৎদর্শনের জন্য কাঁদিয়া

আকুল হন। তখন শ্রীভগবানের আসন অমনি টলিয়া উঠে। ভক্তবৎসল আর কি করিয়া ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, ভক্তের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হন! তখন ভক্তের উদ্ধারের জন্য ভক্তকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য, ভক্তহৃদয়ে মধুর মথুরাপুরীতে পার্ষদগণ সহ আবির্ভূত না হইয়া তিনি আর থাকিতে পারেন না। এইভাবে সাধকগণ সমাধিযোগে সমস্ত জাগতিক ভাবের লয়সাধন করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বের সংস্কারগুলিকে ভগবান বুদ্ধের ন্যায় শূন্যে পরিণত করিয়া সেই মহাশ্মশানে শান্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের জন্ম ও আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই ভগবৎআবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা মহাভয়ঙ্কর—প্রবৃত্তিনিবৃত্তির দেবাসুরের তাণ্ডবনৃত্যের চরম অবস্থা—মা ভবানী সেখানে ভৈরবীরূপে আবির্ভূতা। উভয় শক্তি সেখানে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। সংযত আত্মজয়ী বীর ভক্ত ছাড়া অন্যের পক্ষে এদৃশ্য অনুমান করা, এ যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। বাহ্য জগতেও যখন তিনি অবতাররূপে প্রকট হন, প্রকৃতি দেবী তখন যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসেন। রজনী ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন—বিদ্যুৎ বজ্র ও বর্ষার প্রভাবে জীবজন্তু তখন ভয়ে অস্থির! বলা বাহুল্য, এই অবস্থা অসাধকের পক্ষে যেমন মহান দুর্দৈব, প্রকৃত সাধকের পক্ষে আবার ঠিক তেমনি একটি মহান সুযোগ; প্রকৃতির লয়োন্মুখী তালের সঙ্গে সঙ্গে সাধক তখন

মনোবৃত্তিগুলি লয় করিয়া সমাধিযোগে ভগবৎভাবে বিভোর হইয়া যান। অসাধকের অত্যাচার সাধক-দের করুণ প্রার্থনা চরমাবস্থায় না গেলে কি ভগবানের প্রকাশ সম্ভবপর হয় ? যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব যেখানে চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হয়, সেই অসিমুণ্ডের তাণ্ডব নৃত্যের মাঝখানেই তো মা আমার বরাভয়-হস্তে উপস্থিত হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে প্রিয় সন্তানগণকে অভয়-বাণী শুনাইতে আরম্ভ করেন। বাধা না পাইলে শক্তির বিকাশ হয় না ; তাই অন্তর-রাজ্যে বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব (সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং) ও ভগবানের দৈবী প্রকৃতি ভগবতী দেবকী দেবী আজ কংসের কারাগারে সংস্কারের অহঙ্কারের অন্ধকার-সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ভাবরাশির মধ্যে বিশেষভাবে অবরুদ্ধ। সাধকের নিত্য সর্ব্বগত স্বরূপ, প্রকৃতির সর্ব্বার্থ-সাধিকা অমোঘ শক্তিকে যেন জোর করিয়া অহংকারে বিমূঢ় করিয়া দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। ভগবৎদত্ত স্বাভাবিক শক্তিগুলি ভগবৎইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়া গণ্ডীর বাহিরে প্রকট হইতে চেষ্টা করিলেও প্রহরীদের প্রভাবে অহন্তা-মমতা কামনা-বাসনার তীব্র সংস্কারগুলির জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আসক্তি সংস্কার সব শুভকাজে বাধা দেয়, জীবের সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দিতে চায় না। সাধক মাত্রেই সাধনরাজ্যের বিঘ্নগুলিকে ঋষিদিগের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারেন। বাহিরের

প্রকট লীলার বিঘ্নগুলি—কংসের অত্যাচারের বিবরণগুলি সকলেই জানেন; ভিতর-বাহিরের সামঞ্জস্য নিত্য ও লীলাভাবের মধ্য দিয়া সাধক মাত্রেই আস্বাদ করিবার সুযোগ পান।

এখন দেখা যাউক, জন্মাষ্টমীর ব্রত বা সাধনাটী কি ব্যাপার। শ্রীভগবানের নৈমিত্তিক লীলা-অবলম্বনে সাধক ভক্ত নিজের ভিতরে ভগবানের নিত্যলীলার একটা আভাস পান, নিত্যলীলা-দর্শনের একটা সুযোগ লাভ করেন। দিনবিশেষের এই সুযোগ এই অনুভূতি সমগ্র বৎসর-ব্যাপী হইয়া সাধককে ভগবৎভাবে বিভোর করিয়া রাখে। সমস্ত ব্রতের প্রথম কাজ সংযম। দেহীকে ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার-আদি সমস্ত তত্ত্ব-হইতে সর্ব্বতোভাবে সংযত রাখিয়া, ভগবৎতত্ত্বাস্বাদনের অধিকারী করিয়া তুলিয়া—অন্তর্মুখী করিয়া লইয়া নিস্তব্ধ রজনীতে সমাধিযোগে ভগবানে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। তখন আরম্ভ হয় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিজলীর লীলা, মধ্যে মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ; তৎপরে সেই প্রকাশ স্থায়িত্ব লাভ করিয়া ঘনীভূত হইয়া সাধককে আনন্দে বিভোর করিয়া দেয়। তখনকার সেই আনন্দসমাধির মধ্যে আবির্ভূত হন সচ্চিদানন্দঘন অখিল আনন্দরসের সারভূত সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সমস্ত বাধাবিঘ্নের মাঝখানেও সাধক শ্রীভগবানকে মঙ্গলময় মনে করিয়া

তাঁহার ধ্যানে আনন্দসমাধিতে বিভোর না থাকিলে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করা ভগবৎদর্শন লাভ করা যে একান্ত অসম্ভব কথা।

ভগবানের আবির্ভাবে বসুদেব-দেবকীর সাধকসাধিকার জন্ম সফল হইল, সমস্ত বন্ধন খুলিয়া গেল—ত্রিবিধ গ্রন্থি-বিমুক্ত হইয়া সাধক তখন ভগবৎকৃপায় ভগবৎসাহায্যে প্রেমযমুনার পরপারে গিয়া গোলোকে ভগবৎধামে যোগীদের বর্ণিত সহস্রারে উপস্থিত হইলেন। অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম পুষ্টিলাভ করে, পূর্ণভাবে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়—সংসারের অপর পারে অপ্রাকৃত ভগবৎধামে। সংসারের কামনাবাসনা-আসক্তির পূতিগন্ধ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না—পুতুনাদিরূপী কামনাবাসনা সেখানে গিয়া কোনও মতে উপস্থিত হইলে ভগবৎসান্নিধ্য-লাভ মাত্রই সেই কাম ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া মদনের ন্যায় পুনর্জন্ম লাভ করিয়া প্রেমে পরিণত হয়—পুতুনা মাতার ন্যায় সদ্গতি লাভ করে।

জন্মাষ্টমীর পরদিন ভগবৎদর্শনলাভের পরে অনুষ্ঠিত হয় নন্দোৎসব-লীলা,—সর্ব্বত্র তখন কেবল আনন্দই আনন্দ! তখন যে সবই মধু—আনন্দে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে জগৎ ভরপুর। তখন যে দৃশ্য মধুর, দ্রষ্টা মধুর, তুমিও মধুর, আমিও মধুর,—আমার মধুরাধি-পতির সকলই মধুর। সাধক তখন নিজে ভগবৎসান্নিধ্যে 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্' হইয়া গিয়া জগৎকে সেই পরমসুন্দরের আনন্দবিভূতিরূপে দর্শন করিয়া জীবসেবা দ্বারা শিবসেবাকে সার্থক করিয়া

তোলেন। তখন যে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-দর্শন। জন্মাষ্টমীব্রতের স্থূল উপবাস সাধকের দেহস্থ রস-পরিপাকের স্বাস্থ্যসম্পাদনের বিঘ্ননাশের সহায়, আর সূক্ষ্ম উপবাস ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া চিত্তশুদ্ধির সহায় হয়; এবং কারণভাবের উপবাস জীবাত্মাকে সংস্কারবর্জ্জিত করিয়া ভগবৎদর্শনে সামর্থ্য দান করে। তারপরে জন্মাষ্টমীর ব্রত দ্বারা সাধক নিজের ভিতরে ভগবৎপ্রকাশ ভগবৎলীলা সন্দর্শন করিয়া জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতির ব্রহ্মসেবার অধিকার লাভ করে। নন্দোৎসব দ্বারা সাধকের জীবন সাধকের দৃশ্য জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মভাবে ভাবিত ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত-সত্তার লোপসাধন করিয়া 'একমেবা-দ্বিতীয়ং' তত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করে।

সাধনরাজ্য বিঘ্নে সমাচ্ছন্ন; সাধক যেমন অগ্রসর হইতে সচেষ্ট, জাগতিক সংস্কারগুলিও তেমনি বাধাপ্রদানে নিরত,—উভয়েই শৌর্য্যে বীর্য্যে সমতুল। ইহার মধ্যে সাধকের বলভরসা ভগবৎকৃপা। তুমি যথাশক্তি চেষ্টা করিলে শ্রীভগবান তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন, নিশ্চয়ই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, নিশ্চয়ই তুমি ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তবে এ কাজে তোমাকে ব্রতী হইতে হইবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, সংযম করিতে হইবে সাধনা করিতে হইবে। পরিশেষে ভগবানের আবির্ভাবে তোমার চিত্ত আনন্দসমাধিতে বিভোর হইয়া যাইবে।

মৃদ্‌ভক্ষণলীলা

শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তাই যেখানে তাঁহার সত্তা ফুটিয়া বাহির হয়, সেইখানে তাঁহার চৈতন্য ও আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়ে। এইজন্যই বোধ হয় আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবনধামের আনন্দলীলার মাঝখানেও আমরা সময় সময় সচ্চিদানন্দাত্মক ঐশ্বর্য্যরসের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। ইহা যেন আনন্দ-ভাবকে আরও ঘনীভূত করিয়া দেয়, প্রেমাস্পদকে আরও মধুরতর করিয়া তোলে। রাজমাতা রাজবনিতা রাজার ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য-ভাবকে বেশী ভালবাসিলেও লোকের মুখে তাহার বীরত্বের মহত্ত্বের কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। বীর্য্য ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে প্রেম সুন্দরভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাই বিশেষভাবে প্রশংসিত হইবার যোগ্য। কাপুরুষের প্রেম কামনামে অভিহিত হইয়া নিন্দার ভাজন হইয়া পড়ে, প্রকৃত বীরের প্রেম সংযমের ভিতর দিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করে। কাদামাটির জল দেখিতেও খারাপ খেলেও অসুখ করে, পাথর-ভাঙ্গা গঙ্গাজল দেখিতেও সুন্দর খেলেও স্বাস্থ্য

পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দান করে। যে আনন্দ সত্তা ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হয় তাহা জগৎকে মাতাইয়া তোলে, যে প্রেম ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ না হইয়া ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়া আপন উৎকর্ষ জ্ঞাপন করে সেই প্রেম জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া চিরকাল ভক্তহৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীরাধাকে এই জন্যই বোধ হয় চেতন-জলের ফুটন্ত ফুল বলা হইত।

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মের পূর্ণাবতার, লোকচক্ষে আজ সামান্য বালক-দেহে সীমাবদ্ধ। তাঁহার ভিতরকার অসীম ভাবগুলি সসীম দেহে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সময় সময় স্থূলদেহ ভেদ করিয়া বাহিরে যেন উথলিয়া পড়ে। সাধারণ জীব তাঁহার দিব্য জন্মকে প্রাকৃত জন্ম, তাঁহার দিব্য দেহকে প্রাকৃতিক দেহে সীমাবদ্ধ করিয়া সেই ব্রহ্ম-বালককে একজন নরবালকে পর্য্যবসিত করিতে চায়। কিন্তু স্বভাবকে কতক্ষণ চাপা দিয়া রাখা যায়, আগুনকে কতক্ষণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা যায়? তাইতো সময় সময় আসল স্বরূপের একএকটা ঢেউ দেহ ভেদ করিয়া লোককে বিমোহিত করিয়া বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে। তবে তাহাও যে সাধারণতঃ ভগবৎকৃপা ব্যতীত দর্শন করিতে আস্বাদ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করার পরেও যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপটি ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারিলেন না—অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাল করিয়া

দেখিয়া লওয়া তাঁহার শক্তিতে কুলাইল না। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাল্যলীলায় সেই বিশ্বরূপ একদিন মা-যশোদাকে মৃদ্‌ভক্ষণলীলার ছলে নিজের মুখের ভিতরে দর্শন করাইয়াছিলেন। সখাগণ—এমন কি, মা-যশোদা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সর্ব্বগত প্রাণগোপালকে একটা স্থূলদেহে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা আর কৃষ্ণচন্দ্র কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর একজন সামান্য জীবের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অন্নজলের জন্য অস্থির হইয়া পড়িবেন, ইহা যে একটা মস্ত বিড়ম্বনার বিষয়! সখাদের গোপীদের মা যশোদার এই ভুল ভাঙ্গিয়া তাহাদের সাময়িক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদ্‌ভক্ষণলীলা। তাইতো আজ পরম রসিকশেখর যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখাদের সম্মুখে একটু মাটি মুখে দিলেন। পাছে প্রাণগোপালের কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সখাগণ তখন অধীর হইয়া পড়িল, আর অমনি তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া মা-যশোদার নিকট সব ঘটনা ব্যক্ত করিয়া দিল। রসিক কৃষ্ণচন্দ্রও তখন লীলারস বিস্তারের জন্য একটা ভয়ের অভিনয় করিয়া মুখ খুলিয়া বলিলেন দেখতো মা, আমি কোথায় মাটি খাইয়াছি? আমার সঙ্গীগণ আনাকে ভুল বুঝিয়াছে। যশোমতী তখন শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতরে বেদের বিরাটপুরুষ-তত্ত্ব গীতার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিছুপরে শ্রীকৃষ্ণ মার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের

ঐশ্বরিক রূপটি সংবরণ করিয়া মা-যশোদার তুলাল-রূপে প্রতিপন্ন হইয়া মায়ের নিকট আবদার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেদ-বেদান্তে যে বিরাটরূপ তত্ত্বাকারে বর্ণিত, আজ শ্রীকৃষ্ণজীবনে তাহা অভিনীত হইয়া গেল।

বৃন্দাবন অপ্রাকৃত প্রেমের দেশ, সেখানকার সকলেই প্রেমসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমরস বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে তুইএকটা জ্ঞানের তেজ আসিয়া পড়িলেও তাহা যে আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। যেখানে যে রস প্রধান সেখানে সেই রসই যে স্থায়ীভাব লাভ করে। উপনিষদের পরব্রহ্মই তো লীলার ছলে সেখানে মা-যশোদার রজ্জুবন্ধনের ভয়ে শ্রীরাধার মানের দায়ে অস্থির হইয়া পড়েন। ভগবৎকৃপা ছাড়া অহংতত্ত্ব কি ভগবৎতত্ত্বকে কোনও রূপে ধারণায় আনিতে সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? যে হাত অবলীলাক্রমে কংস-শিশুপালের মস্তকছেদনে দক্ষ সেই হাতই যে আজ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবালার বাহুপাশছেদনে অসমর্থ! জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যে ভগবানের হাতের মুঠির ভিতরে বিদ্যমান, তিনি যে আজ বৃন্দাবনে পাতার পতনশব্দে শ্রীরাধার আগমন মনে করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যান। যে পরমাত্মা সমস্ত ঋষি-মুনি-সিদ্ধ-মহাত্মাদের গুরু ইষ্ট উপাস্য, তিনিই যে আজ শ্রীবৃন্দাবনে সখা-সখীদের গলা ধরিয়া রাধালাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে শশব্যস্ত। অপ্রাকৃত ধামের সবই যে অলৌকিক, প্রাকৃত

জগতের ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার দর্শন, প্রাকৃত জগতের মন দিয়া তাহার অনুভূতি যে একেবারে অসম্ভব কথা! স্বরূপ-তত্ত্ব ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করা, ইহার ভিতরকার সামঞ্জস্যটা সব সময়ে মনে রাখা যে সাধারণ জীবের পক্ষে একান্ত-ভাবে অসম্ভব। সিদ্ধ-মহাত্মাগণ ভগবৎকৃপায় এই তত্ত্ব কত-টুকু আস্বাদ করিবার সুযোগ পান মাত্র। বৈজ্ঞানিকদিগের মতেও তো যাহা সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে ঠিক, তাহাই তো আবার একটা পরমাণু সম্বন্ধেও ঠিক what is true of the universe is also true of every atem of universe "একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" know one thing and you will know every thing—এককে জানা হইলেই তো সকলকে জানা হয়। সামান্য একগ্রাস স্বচ্ছ জলে সামান্য একখানা পবিত্র দর্পণে যে সমস্ত আকাশটি প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধকদের স্বচ্ছ চিত্ত-দর্পণে পূর্ণাবতারের স্বচ্ছাতিস্বচ্ছ নির্ম্মল দেহে ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। তারপরে যিনি দর্শন করিলেন তিনি যে গীতায় শ্রীভগবানের প্রিয়তম সখা, ভাগবতে শ্রীভগবানের মা-যশোদা, যাঁর হাতে শ্রীভগবানের লালন-পালনের সব ভার শ্রীভগবানের যোগমায়া কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছিল। পূর্ণসিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন ও অনুভূতিকে আমরা আমাদের এই সামান্য সীমাবদ্ধ দর্শন ও অনুভব-শক্তিতে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি। মনে রাখিতে হইবে,

অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টি লাভের পূর্ব্বে বিশ্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হন নাই। মৃদ্‌ভক্ষণলীলা ব্যষ্টিদেহে সমষ্টির, স্থূল পূর্ণ-বিকশিত দেহে সব তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ আত্মার নিত্য সর্ব্বগত ভাব প্রকাশ করে।

———

গোচারণ

গোচারণ কৃষ্ণচন্দ্রের অতি প্রিয় লীলা, তাই রোজ গোচারণে না গেলে তাঁহার চলে না। তিনি যে গোপাল, তাই গোষ্ঠেই তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। গোষ্ঠ কোথায় জান ত? "গাবস্তিষ্ঠন্তি অত্র ইতি গোষ্ঠঃ—গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি।" গরুগুলি যেখানে থাকে তাহার নাম গোষ্ঠ, গরুগুলি একএকটি ইন্দ্রিয়। পূর্ব্বগোষ্ঠ ও উত্তরগোষ্ঠ-লীলা সাধকদের সাধন করিতে ধ্যান করিতে হয়। ভগবানের সৃষ্টি ও লয়-লীলা বল খেলার মত অনবরত চলিতেছে। সৃষ্টির সময় জগৎ তাঁহা হইতে বাহিরে আসিয়া কতরূপে কতভাবে কত কি খেলা খেলিয়া লয়ের সময় আবার তাঁহাতে গিয়া লীন হইতেছে—সাধকগণ এই গোষ্ঠলীলা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। দিন সৃষ্টি এবং রাত্রি

লয়-লীলা আস্বাদন করিবার সময়। রাত্রে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে এবং কারণ ব্রহ্মে লীন থাকে। সকালে অনুলোম-পরিণামে ইহারা আবার বহির্মুখ হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়াদি তখন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। অসাধকের ইন্দ্রিয় ভোগের প্রতি ধাবিত হয়। সাধকদের অন্তরিন্দ্রিয় ভগবৎধ্যানে বহিরিন্দ্রিয় শব্দ-স্পর্শাদির মধ্য দিয়া ভগবৎদর্শন ও স্পর্শন করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতিতে নিযুক্ত থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গরু মন (চিত্ত)। সংস্কার ভগবৎঅনুভূতির স্মৃতি তাহার আহার, অষ্টকালীয় ধ্যান এই গোচারণাদির নামান্তর মাত্র। অন্য গরুগুলি যথাক্রমে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক ইত্যাদি। পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র একএকটি গরুকে নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া উপদেশ দিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া আহারান্বেষণে (বিষয়গ্রহণে) ছাড়িয়া দেন। চোখকে কৃষ্ণপ্রেমাঞ্জনের কাজল পরাইয়া দিয়া রূপ-গ্রহণরূপ আহার অন্বেষণে পাঠান হয়, বলিয়া দেওয়া হয়—বেশী দূরে যেওনা, জঙ্গলে হিংস্র জন্তুদের (প্রলোভনের বস্তুদের) বড় ভয় আছে; আমার শব্দব্রহ্মময় বেণুর শব্দ যত দূর শোনা যায়, তাহার বাহিরে যেও না—যে যে জিনিস যে যে ভাবে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপক শুধু তাহা নিয়েই থেকো। আমি কি সুন্দর আমাকে নিয়া আমার জগৎ কি সুন্দর, তাহা ভাল করে আস্বাদ করো; দেখ, তোমারই তৃপ্তির জন্য আমি এই ভুবনমোহন রূপ ধারণ করেছি।

এইভাবে অন্যান্য গরুগুলিকেও সাজাইয়া বুঝাইয়া গো-চারণে পাঠান হয়। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা করা হয়। "আহ্রিয়তে মনসা বুদ্ধ্যা ইন্দ্রিয়ৈঃ যঃ সঃ আহারঃ" মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকিছু গ্রহণ করা যায় তাহাই যে আহার, এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ইন্দ্রিয়রূপী গরুগুলি সারাদিন ধরিয়া পেট ভরিয়া আহার করিয়া সকলের মধ্য দিয়া ব্রহ্মানন্দ পূর্ণভাবে আস্বাদ করিয়া সন্ধ্যাবেলা কৃষ্ণচন্দ্রের—স্বীয় পরমাত্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত। প্রকৃতি এখন স্বামীর অঙ্গে লীন। কাজগুলি গুটাইয়া এখন যে তাহাকে পুরুষে তন্ময় হইয়া সমাধিসুখ নির্ব্বাণআনন্দ ভোগ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াদির মনে, মনের বুদ্ধিতে, বুদ্ধির জীবাত্মায়, জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হইবার সময় আসিয়াছে; তাই এখন কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর-গোষ্ঠলীলা লইয়া গরুগুলিকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাব্যস্ত। পূর্ব্বগোষ্ঠে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ জগৎ তাঁহা হইতে বাহির হইয়া সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎরূপে লীলা করিতে যায়। উত্তর-গোষ্ঠে ইহারা আবার প্রতিলোমপরিণামে ভগবানে লয় হইয়া পরম নির্ব্বাণসুখ আস্বাদ করিতে থাকে। রাত্রি তাই বিশ্রামের সময় সমাধির সময়। সাধকদের এ সময় মার কাছে প্রিয়তমের কাছে না গেলে চলে না। সন্ধ্যাবেলা আকাশ গাছ পাতার ভিতর দিয়া প্রিয়তমের আহ্বানে তাঁহারা একেবারে বিভোর হইয়া যান, বাহিরের

সকল কর্ত্তব্যজ্ঞান লোপ পায়—সমাধি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদা এই উভয়বিধ গোষ্ঠলীলা আস্বাদ করা যায়। "যং যং কামান্ কাময়তে মন্যমানঃ সঃ কামভির্জায়তে তত্র তত্র" একএকটা কামনার উদয় ও পূরণের মধ্যে ভগবানের সৃষ্টি ও লয়-লীলার গোষ্ঠলীলার অনুভূতি হইতে থাকে। সাধক এসময় ভগবানের সৃষ্টি ও লয়ের খেলা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। নিজের ভিতরে কৃষ্ণচন্দ্রের গোচারণ-তত্ত্ব সমাধিযোগে অনুভব করিয়া লইলে জগতে গোচারণ-লীলা দর্শন করিতে ভাগবতের গোচারণ-লীলা আস্বাদ করিতে আর অসুবিধা হয় না।



চৌর্য্যলীলা

পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে চুরি করা বলে। কাহাকেও চোর বলিবার আগে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সে যে দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার নিজের কি অপরের ; তাহার পরে দেখিতে হইবে যে তাহার এই গ্রহণকরার মধ্যে যাহার দ্রব্য তাহার ভিতরে উক্ত ব্যক্তিকে এই দ্রব্যটি দিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান ছিল কিনা। ভিতরে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি বাহিরে একটা অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ পায়, তবে আমরা তাহাকে চুরির অভিনয় বলিলেও প্রকৃত চুরি বলিতে পারি না। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তিনি যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সকলের ভিতরকার অন্তর্য্যামী পুরুষ, সমস্ত জীব সমস্ত জগৎ তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ;—কারণ তিনি নিজেই যে জগৎরূপে জীবরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে পরের জিনিস বলিয়া কোনও কথাই থাকিতে পারে না। আজকালকার দিনেও সময় সময় এমন সিদ্ধ-মহাত্মা দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি আত্মপর ভেদভাব দূর করিয়া সর্ব্বত্র আত্মানুভূতি-লাভে আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণের কথা

বলা হইতেছে, তিনি যে এই সকল আত্মারাম সিদ্ধ-মহাত্মাগণেরও আরাধ্য দেবতা। তারপরে বৃন্দাবনের গোপীগণের পক্ষে কিছুই যে কৃষ্ণকে অদেয় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোনও জিনিস গ্রহণ করিলে তাহারা যে তাহাদের জন্ম সার্থক মনে করিত, তাহাও আমরা ভাগবতপাঠে অবগত আছি। দেহ-প্রাণ-মন—এমন কি, আত্মা পর্য্যন্ত যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই গোপীগণের পক্ষে মনোচোরা কালা-চাঁদের কাছে কোন বস্তু যে অদেয় বা অদত্ত ছিল তাহাও যে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। তবে বৃন্দাবন-তত্ত্বে আমরা যে মানাদি-রহস্য দেখিতে পাই তাহা যে শুধু লীলা-রসপুষ্টির জন্য ; এবং উহা কেবল সাধক-ভক্তগণেরই আস্বাদ্য তত্ত্ব। প্রাকৃত জীব প্রাকৃত মন লইয়া সে তত্ত্ব আস্বাদ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ।

দেখা গেল, চুরিশব্দের অভিধানমতে শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলা যায় না ; এবং লীলারসপুষ্টির জন্য তিনি যে চৌর্য্য-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধমহাত্মাগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ। এখন এই লীলা একটু বিচারের চোখে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক। সব কাজ যখন শ্রীভগবানের তালে তালে চলিতে থাকে তখনকার বিধিব্যবস্থা একরূপ, আর যখন বেতালে চলিতে থাকে তখনকার বিধিব্যবস্থা অন্যরূপ। তাইতো ধর্ম্ম এক হইলেও প্রকাশভেদে দেবতার

ধর্ম্ম ও অসুরের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের। এইজন্য অনেক সময় দেবভাবে যাহা সত্য অসুরভাবে তাহা অসত্য, দেবভাবে যাহা ধর্ম্ম অসুরভাবে তাহা অধর্ম্ম। দেবাসুরের সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনেকটা বিভিন্ন রকমের।

আমাদের এই সংসারে দেবতা ও অসুর এই উভয় তত্ত্বই বর্ত্তমান, এইজন্য সকলের ভাব ও কাজ সব সময় এক রকমের হয় না। যখন দেবতাদের সত্ত্ববৃত্তির সাত্ত্বিকভাবের পরিণতি দেখা যায়, তখন ভগবৎভাব তাত্ত্বিকভাব ও লৌকিকভাবগুলি প্রায় একভাবেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। যখন আসুরিকভাবের তমো-রজের প্রাধান্য চলে, তখনকার লৌকিক সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ভাবগুলি প্রায় দেবভাবের তাত্ত্বিকভাবের ভগবৎ-ভাবের প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়। তখন যে শক্তিমান তাহার মতেই প্রায় সকলে চলিতে বাধ্য হয়। এইজন্যই তো আলেকজাণ্ডারের লর্ড ক্লাইবের চুরি-ডাকাতির এত প্রশংসা আর সাধারণ চোরের এত নিন্দা। আমার শক্তি আছে—আমি সকলকে ছলেবলে কৌশলে দাবাইয়া রাখিব, সকলের উপর আধিপত্য করিব, সকলের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইব; আমার একাজকে কেহ কুকাজ বলিতে পারিবে না, আমার একাজকে বীরের কাজ বলিয়া সকলে প্রশংসা করিতে বাধ্য। আর যে কারণেই হউক, যে ব্যক্তির মুখের গ্রাস অন্যে জোর করিয়া কাড়িয়া

লইয়াছে, যে নিজে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, যাহার চোখের সম্মুখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অন্নাভাবে রোগ-যন্ত্রণায় বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, সে যদি জীবনধারণের সন্তান-পালনের কোনও উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া কাহারও কুভাবে-সঞ্চিত অনাবশ্যকীয় অর্থের কিয়দংশ গ্রহণ করে তবে সে চোর বলিয়া ধৃত হইবে, অপরাধী বলিয়া শাস্তি পাইবে,—এই সমস্ত বৈষম্য ভগবান এবং ভগবৎঅবতার-গণ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। ধনীর সন্তানের জন্য একরূপ ব্যবস্থা আর গরীবদের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা, এই সব বৈষম্য সমত্বলাভের ব্রহ্মদর্শনের বড়ই যে প্রতিকূল। এইজন্য অবতারদেব জীবনে অত্যাচারী রাজাদের অসুরদের বিধর্ম্মী নর-পিশাচদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সেই সব অবতারদের ঐসব কার্য্যকলাপের ভিতরেও দেখা যায় যে, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডআদি নীতিগুলিও যথাসম্ভব পালিত হইয়া থাকে; কারণ যিনি ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, যিনি ধর্ম্মের স্বরূপ, তিনি কখনও প্রকৃত কল্যাণকারী বিধি-ব্যবস্থাগুলির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। ধর্ম্মের নামে যে সকল অধর্ম্মানুষ্ঠান চলিতে আরম্ভ করে, সেই সব দূর করিয়া দেওয়াই তো ইঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে জন্ম হইতেই তাঁহাদের একটা

বিশেষ বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চৈতন্য যীশু মোহম্মদ নানক রামমোহন আদির জীবনের কার্য্যকলাপের সূচনা তাঁহাদের বাল্যজীবন হইতেই আমরা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণজীবনে সর্ব্বত্র আত্মানুভূতির সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের চিহ্ন আমরা তাঁহার বাল্যজীবন হইতেই লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। বাল্য-সখাদের সহিত ব্যবহারে লীলাখেলায় তাঁহার কোনও ভেদভাব ঈর্ষ্যাদ্বেষ আদির ছায়া পর্য্যন্ত কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। গোপীগণ যখন উদ্বৃত্ত ননীমাখন দুগ্ধদধি প্রভৃতি বেচারী পশুপক্ষী গুলিকে বঞ্চিত করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিতেন, বাল-গোপাল তখন সেইগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া নিজে খেতেন সখাদের খাওয়াইতেন, আর বনের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গদিগকে বিলাইয়া দিতেন। সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য দ্রব্যগুলি এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে—শুধু একের ভোগে লাগিবে, সর্ব্বভূত-হিতে রত সর্ব্বান্তর্য্যামী তাহা আর কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, যিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ নিজস্ব বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া অন্যকে বঞ্চিত করেন তিনিই প্রকৃত চোর। আমাদের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সঞ্চয়ী চোরদের ধনগুলি শাস্ত্রসম্মতভাবে অপহরণ করিয়া লইয়া যাহাদের তাহাতে ন্যায্য অধিকার হওয়া উচিত, যাহাদের তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন তাহাদিগকে উহা

বিতরণ করিয়া দিতেন। বালকৃষ্ণকে কেহ চোর বলিলে তিনি জোর করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে তিনি চোর নন, কেন কিভাবে তাহারাই প্রকৃত চোর। সর্ব্বত্র সমভাব সর্ব্বত্র আত্মানুভূতি কৃষ্ণজীবনে শৈশব হইতেই পরিদৃষ্ট হইত। গীতায় যে তিনি তাঁহার জন্ম-কর্ম্মকে কেন দিব্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কৃষ্ণজীবনে বাল্যকাল হইতেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। যে সব গোপী শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে আসক্ত একান্তভাবে তন্ময় থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাহাদের ঘরেই ননীমাখন চুরি করিতেন। চুরি করিবার আগেই সে সব ননীমাখন ভগবানে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হইয়া থাকিত; শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাপ্য নিজে জোর করিয়া চুরি করিয়া দাতা গ্রহীতা দ্রষ্টা ও শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন মাত্র। তাঁহার এই চৌর্য্যলীলা যে শুধু বাহ্যিক স্থূল ননীমাখমেই পর্য্যবসিত হইত তাহা মনে করিও না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে তাঁহার প্রিয়তমা স্বরূপশক্তি গোপীদিগের মন-প্রাণ আত্মা পর্য্যন্তও চুরি করিয়া ফেলিতেন! অমন চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইলে কোন্ পবিত্র লৌহ তাহার কাছে না গিয়া থাকিতে পারে? এই চুরির ফলে গোপীদের পক্ষে যে তাঁহাদের পরম সাধন আত্মনিবেদন-তত্ত্ব সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িত। তিনি ডাকিলে তিনি টানিলে কে না গিয়া থাকিতে পারে, তিনি চাহিলে কে না দিয়া থাকিতে পারে? তারপরে যাঁহার ধন তিনি লইবেন তাহাতে কে বাধা দিবে?

"তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার হে"

"প্রতীচ্ছ হে স্বস্য ধনং স্বয়ং ত্বং
কিঞ্চিৎ নিজস্বং নহি বিদ্যতে মে
যদ্দীয়তে ত্বচ্চরণে মুকুন্দ।"

এই শ্লোকগুলি অনুভব করিতে চেষ্টা কর। যদি বল, তিনি তবে জোর করিয়া বা গোপনে লইতেন কেন? তবে বুঝিতে হইবে, তুমি এখনও শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিবার অধিকার লাভ কর নাই। এক কেন বহু হন, অব্যক্ত কেন আপনাকে এই ভাবে প্রকাশ করেন, তাহা জীব কি করিয়া বুঝিবে? ঋষিগণ বলেন ঐভাবে লীলা করাই নাকি রসিকশেখর বাল-গোপালের স্বভাব। যাহা হউক, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা এইভাবে অপহৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে তন্মনস্কা তদাত্মিকা হইয়া ভগবৎপ্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। চৈতন্যলীলায় চৈতন্যদেবের ভক্ত-গণকেই তাঁহার উপদ্রবগুলি বেশী করিয়া সহ্য করিতে হইত। বেচারী শ্রীধরের নিকট হইতে জোর করিয়া কলার খোলা ও মোচাগুলি অপহরণ করিয়াই তো শ্রীধরকে ভক্তসমাজে এতটা বরণীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। গদাধরকে দেখিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন সাদরে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া তিনি তাহার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। পরিণত-বয়সে চৈতন্যদেবের সেই সব উপদ্রবকাহিনী স্মরণ

করিয়া সেই সব উপদ্রবে পীড়িত ভক্তগণ পরমানন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা শ্রীভগবানের অহেতুকী কৃপা ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতেন না। তার পরে বুঝিতে চেষ্টা কর সিদ্ধাবস্থায় জীব কেন কিভাবে চোর-ডাকাতকেও ভগবৎবিভূতিভাবে দর্শন করেন, এদিকে আবার অসাধক ভগবৎঅবতারের ভগবৎ-লীলার মধ্যেও কত কুৎসিতভাব আরোপ করিয়া নিজে আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া অন্যকে আনন্দলাভে বঞ্চিত করিয়া তোলেন। কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যেমন সাদা দেওয়ালও হল্‌দে বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক, কৃষ্ণরসভাবিত-মতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকটও তেমনি জগৎব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণরূপে দৃষ্ট ও অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণ গুণাতীত কৃষ্ণ শ্রীভগবান বলিয়া যাহারা তাঁহার কার্য্যগুলিকে অন্যায় বুঝিয়াও তাহা সমর্থন করিতে যাইবেন, কৃষ্ণকে চোর-বদ্‌মাইস বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও যাহারা তাঁহাকে ভক্তি করেন, তাহাদের সহিত আমরা কখনও একমত হইতে পারি না। আমরা যাহাকে ভক্তি করিব ভালবাসিব পূজা করিব, তিনি শ্রীভগবান হউন বা না হউন তাঁহাকে নিশ্চয়ই একজন আদর্শ মানুষ হইতে হইবে। তিনি গুণাতীত হইলে তাঁহার সে অবস্থা সত্ত্বগুণের উপরে বই নীচে নহে। নিষ্কামীর কর্ম্ম কখনও তামসিক-ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। পূর্ণ

সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে সাধককে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হইতে হয়, সাত্ত্বিকভাবে সাধন করিতে হয়। তাহার পরে সিদ্ধাবস্থার যদি কাজ থাকে, তবে তাহাও সাত্ত্বিক হওয়াই স্বাভাবিক। কুম্ভকারের চক্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরেও ঘুরিতে থাকিলে পূর্ব্বের অনুকূলভাবেই ঘুরিবে। আদর্শ মানুষ কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারেন না; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সীমাবদ্ধ ন্যায়অন্যায়ের মানদণ্ড দিয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইব না। "তেজীয়সাং ন দোষায়" কথার মধ্যে আমরা এই ভাবই দেখিতে পাই। দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—ইহার মানে তিনি এমন কোনও কাজ করেন না করিতে পারেন না যাহা দোষের।

বস্ত্রহরণ

বস্ত্রহরণ-লীলা সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা লেখা হইয়াছে, সেগুলি পড়িয়া দেখিও। আজ অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুইএকটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করিব। মনে রাখিতে হইবে বস্ত্রহরণ করা হইয়াছিল কাহাদের। বুঝিতে চেষ্টা কর ঋষিপত্নীদিগকে কোন্ অবস্থায় কিভাবে কেন ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিত্তে সংসারের কর্ত্তব্য জ্ঞানের সংস্কার থাকিতে বস্ত্রহরণ করা হয় না, তাহারা ততক্ষণ বস্ত্রহরণলীলা আস্বাদ করিবার অধিকার লাভ করেনা। নিত্যলীলায় অহংতত্ত্ব নাশের পরে সাধকদের বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা এই চারিখানি আবরণ-বস্ত্র শ্রীভগবান হরণ করিয়া লন। প্রথম বস্ত্রহরণে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত দর্শনটি খুলিয়া যায়, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি হরণ করিলে সূক্ষ্ম আর কারণের মধ্যস্থিত আবরণটি দূর হয়, তৃতীয় আবরণখানি দূর করিলে জীবাত্মার স্বরূপদর্শন ঘটে, চতুর্থ আবরণখানি অপহৃত হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানুভূতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান দয়া করিয়া সাধকদিগকে এই নিত্য বস্ত্রহরণ-লীলা আস্বাদ করাইয়া গুণাতীত আবরণমুক্ত করিয়া ভগবৎধামের অধিকারী করিয়া তোলেন। সে দেশে

বাধা নাই আবরণ নাই, ভিতর-বাহিরের মাঝখানে কোনও পর্দ্দা নাই। সেখানে যে সবই মুক্ত সবই খোলা—সবই ভগবৎপ্রেমরসে ভরপূর।

এই তো গেল নিত্যলীলার কথা, যেখানে বস্ত্রহরণ-লীলা পূর্ণভাবে স্বাভাবিকরূপে আপনা হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে নিত্যলীলার রসতত্ত্ব আস্বাদ করাইবার জন্য নৈমিত্তিক লীলা। সেখানকার প্রেম সেখানকার আনন্দ সংসারের জীবকে সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণকে দেখাইয়া দিয়া একটু আস্বাদ করাইয়া লইয়া তারপরে ভগবৎধামের জন্য প্রলোভিত করিয়া তোলা হয়। বর্ণনাগুলির মধ্য দিয়া নিত্যলীলার একটা আভাস প্রদান করা হইয়া থাকে। চৈতন্যজীবনে বস্ত্র-হরণ রাসলীলাআস্বাদনের প্রণালী ইহার সাক্ষী। প্রকট লীলায় গোপীদিগকে নিত্যসিদ্ধা শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহার স্মরণে সকল বন্ধন দূর হইয়া যায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া অনুভব করিয়া তাঁহার প্রেমলীলার সহায় হইয়াও যে গোপীদের ভিতরকার আধ্যাত্মিক আবরণগুলি থাকিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। বাহিরের বস্ত্রগুলিও যে আপনা হইতে খসিয়া পড়াই স্বাভাবিক ছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। সেগুলি দূর করিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র যেসব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য সাধকদিগকে গোপী-

চরিত্রের ভগবৎক্রিয়াকলাপের একটা আভাস দেওয়া মাত্র। যে অবস্থায় আমিত্বের অস্তিত্ব থাকে না, দেহগেহ-স্মৃতি লোপ পায়—আত্মসুখস্পৃহা কৃষ্ণপ্রীতিসাধনের চেষ্টায় ডুবিয়া যায়, সে অবস্থায় যে বাহ্য বস্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে তাহা মনে করিতে যাওয়াই ভুল। প্রকট লীলায় বস্ত্রহরণের মধ্যে আমরা গোপীদের ভিতরকার সব আবরণ দূর হইয়া যাওয়ার তত্ত্ব, একাজে শ্রীভগবানের সাহায্যের প্রয়োজন ও সীমা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। রসরাজ ও মহাভাবের পূর্ণ মিলনে বস্ত্রাদি বাধা দিবে ইহা সাধকগণ সহ্য করিতে পারেন না, তাই সে অবস্থায় কিভাবে বস্ত্রগুলি আবরণগুলি দূর হইয়া যায় তাহার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। যেখানে সাধারণ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের ভিতরের আবরণ দূর হইয়া যায়, সেখানে এই প্রেমতত্ত্বের মূলাধার মূল প্রস্রবণের নিকট একটা আবরণের কল্পনা করিতে যাইব কোন্ সাহসে? সংসারেও এমন ঘটনা অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায় যে, প্রেমাস্পদের শব্দ শুনিয়া প্রেমিকা বিবস্ত্রাবস্থায় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, পথে কোথায় যে বস্ত্রখানি পড়িয়া গিয়াছে তাহাও তিনি ভাবিবার অনুভব করিবার সুযোগ পান নাই। শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অভিসারের পথে ছুটিয়াছেন, রাস্তায় সাপ্‌বাঘ বিপদআপদ যখন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, সেই অবস্থায় পথে তাঁহার কাপড়খানি আপনা হইতে

খসিয়া পড়িলে সে দিকে যদি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, তবে আমি সেই রাধারাণীকে মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত হইতাম না। সাধক-ভক্ত কেন যে ভক্ত ও ভগবানের ভিতরকার সব আবরণ দূর করিয়া দিতে ভাল বাসেন, তাহা সিদ্ধ-মহাত্মারাই বুঝিতে পারেন; তাই তো এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আমরা শুধু কল্পনার চোখে তাহার একটা আভাস দিতে আভাস উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি মাত্র। ঋষিপত্নীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেখান হইল কত উন্নত অবস্থায় গেলে তখন ভগবান বস্ত্রহরণ করিতে ইচ্ছুক হন; বস্ত্রহরণ-লীলায় দেখান হইল কেন চিত্তে সংস্কারের ছায়া থাকিতে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়। জীবকে ভগবৎপ্রেম আস্বাদ করাইতে শ্রীভগবান যত ব্যস্ত, ভক্ত জীব তাহার কোটি ভাগের এক ভাগও ব্যগ্র নহে। ভগবৎকৃপাই ভগবৎপ্রাপ্তির মুখ্য কারণ।

হোলি

আজ হোলি—চারিদিকে রঙে রং। গোপীরা কাত্যায়নী পূজা করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন, বস্ত্রহরণের দ্বারা পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা ও বৈখরীআবরণ দূর হয়ে যাওয়ায় আজ ইহাদের প্রকৃত-চক্ষু দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে ভরপূর, ভক্তহৃদয় আনন্দে মাতোয়ারা—সবই যেন আনন্দে প্রেমে লাল হইয়া গিয়াছে। বসন্তের প্রকৃতি, বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি—তাই আজ মদনমোহন আনন্দলীলায় সমুৎসুক। মঞ্জরীগণ স্থূল শরীরে মূলাধারে বসিয়া পাঁচটি পিচকারী (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) শব্দস্পর্শাদি পঞ্চরঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া সখীদের সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধ্যাদি অন্তরেন্দ্রিয়ের (কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আট পাশ) হাতে দিতেছেন। সখীরা সে সব গ্রহণ করিয়া পবিত্রতর করিয়া শ্রীরাধার—জীবাত্মার হাতে দিতেছেন। জীবাত্মা কারণশরীরে বসিয়া সে সব রং (বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম) কৃষ্ণদেহে অর্পণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার সহস্রারে বসিয়া সেইভাবে অপ্রাকৃত রং (গুণাতীত ভগবৎপ্রেম) জীবাত্মা-মন-বুদ্ধিআদির ভিতর দিয়া বাহিরে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতেছেন। [ইন্দ্রিয় সংযত, চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হওয়ায় জীবাত্মা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ; তাই অপ্রা-

কৃত বৃন্দাবন-ধাম (Kingdom of God) আজ মর্ত্তে আবির্ভূত (Thy kingdom come)। সকলের ভিতর দিয়া তাই আজ ভগবৎইচ্ছা অবাধিতভাবে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে (Thy will be done in earth, as it is in heaven)। প্রেরক ও গ্রাহক একভাবাপন্ন হওয়ায় "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" আজ পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষীভূত। সব বিভক্তিই আজ সেই এক অবিভক্তকে প্রকাশ করিতেছে। রসময় সব ভেদ-ভাব দূর করিয়া সকলকে নিজের রসসাগরে ডুবাইয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র শিক্ষাদানে নিরত। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" চারিদিকে কেবল মধুক্ষরণ হইতেছে, সর্ব্বত্রই কেবল মধু কেবল মধু—সর্ব্বত্রই সেই আনন্দের লীলা !

ঋষিগণ দূরে বসিয়া বুঝিতেছেন কেন উপনিষদ বলেন 'আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়'। আজ সেই পরম রসপানে সকলে আনন্দীভূত তৃপ্তী-ভূত অমৃতীভূত হইয়া গিয়াছেন। গোপীদের তো "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি", "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্" ; এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়াই তো "রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি" গানের উৎপত্তি। ভক্তের নিকট অন্তর্গামী ও বহির্গামী বিদ্যুৎস্রোত (in-going and out-going nerve currents) এই মহাভাবের হোলি খেলার স্মারক। যিনি মদনমোহন ভুবনমোহন বেশে

সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তিনিই মন্মথ-মন্মথরূপে অন্তরে থাকিয়া ভিতরে বাহিরে নিজেকে নিজে দর্শন করিতেছেন— "আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর রে", "স্বমহিম্নিইব স্থিতঃ"। মাঝখানে কতকগুলি তত্ত্ব লীলার সহায়ক-ভাবে সৃষ্ট হইয়াও জীবের সংস্কারদোষে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া লীলার প্রতিকূলভাবে পরিকল্পিত। [সতীর তপস্যা পূর্ণ হইলে মহাদেব মদনভস্ম করিলেন পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যসাধন—শুধু আদর্শ গৃহী হইবার জন্য, সংযম ভোগের অধিকতর সামার্থ্যলাভের জন্য। যতদিন কুভাবে দৃষ্টি ততদিন চোখ-নাক-কান বন্ধ করিয়া সাধন বিধেয়। বিরহাবস্থায় ঢিল ছুড়িয়া কোকিলকে তাড়ান হইল। আবার যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন খুলিয়া গেল, তখন "লাখ আঁখি কেন নাহি দিলা" বলিয়া দুঃখপ্রকাশ। তখনকার গান হয় "আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু" ইত্যাদি।

সকলের ভিতর দিয়া তিনি ডাকিতেছেন আনন্দ দিতেছেন, জীব বুদ্ধির দোষে দেখিতে গ্রহণ করিতে ভোগ করিতে জানে না—তাইত সংসারে দুঃখ। আতর সৃষ্টি হইল নাকে দিবার জন্য, লোকেরা ভুল করিয়া চোখে দিয়া কষ্ট ভোগ করে। ভিতরে নিত্য কৃষ্ণ-লীলার আস্বাদ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরে নৈমিত্তিক কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করা কঠিন। সাধকগণ দিব্যদৃষ্টিতে নিজের

ভিতরে নিত্যলীলা আস্বাদ করার পর বাহিরের প্রকট লীলার সব রহস্য তাহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, জগৎকেই তখন বৃন্দাবন-ধাম বলিয়া মনে হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক লীলা কিভাবে কতটা সত্য তাহা তখন সহজে বুঝিতে পারা যায়। ভিতরে সর্ব্বদা মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলিতেছে, সেটি সাধন-চোখে একবার দেখিতে পাইলে বাহিরের মহাভারত-গ্রন্থ বুঝা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইবে।

মনে রাখিতে হইবে হোলি হয় বসন্তকালে, যখন প্রকৃতি-দেবী অনন্ত সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে লোকের মন হরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্য সাধনা চাই, তপস্যা চাই; তাই হোলির আগের দিন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কামরূপী পুতুনাকে—কামনাবাসনাআসক্তিরূপ প্রাকৃত সংস্কারগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ইহার পরে অনুভূত হইতে আরম্ভ হয় ভগবৎবিভূতি। তখন শব্দ-স্পর্শাদির ভিতর দিয়া ভগবানের আহ্বান ভগবানের আগমন ভগবানের প্রকাশ ভগবানের লীলা সাধকগণ অনুভব করিতে আরম্ভ করেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দস্পর্শাদির ভিতর দিয়াই নিজের যাহাকিছু সব ভগবানে অর্পণ করিয়া আত্মনিবেদন-তত্ত্ব সার্থক করিয়া তুলেন।

হোলি তাই ভগবানের পক্ষে আত্মদান ও জীবের পক্ষে আত্মনিবেদন। জীব ও ব্রহ্ম আপন আপন স্বরূপে বসিয়া এই

লীলার অনুষ্ঠান করেন। ইহা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাধকগণ এই লীলাঅভিনয়ের ভিতর দিয়া ভগবানের বহির্মুখী অবতরণ-লীলা ও জীবের অন্তর্মুখী স্বর্গারোহণ-লীলা আস্বাদ করিয়া জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করেন। ভগবান সৃষ্টির ছলে বাহিরে আসেন, জীব সাধনার ছলে ভিতরে যায়। এই ভিতরে বাহিরে নির্গমন ও আগমন-লীলা, লয় ও সৃষ্টি-রহস্য অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামে কি ভাবে অনুষ্ঠিত হয় হোলি তাহারই একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

*　　　*　　　*

দোল

আমাদের লীলাময় রসিকশেখর আপন যোগমায়ার সাহায্যে এমন সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সৃষ্ট জগতের প্রতি তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিয়া অনুস্যূত হইয়া নিজে অখণ্ড অচল হইলেও জলচন্দ্রবৎ প্রতি তত্ত্বে চঞ্চল দোদুল্যমান লীলাতৎপর ভাবেই অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি তো শুধু আত্মতৃপ্ত আত্মরতি আত্মমিথুন নন, তিনিই যে আবার ক্রীড়াবান্। স্থির থাকিয়া কি আর কাজ করা খেলা করা লীলা করা চলে? এই খেলার জন্য এই দোলের জন্যই তো নির্গুণের সগুণভাব, নিরাকারের সাকার-রূপগ্রহণ, অব্যক্ত অচিন্ত্য তত্ত্বের জগৎজীবরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন। "যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল"—প্রতি তত্ত্বে মা যে নিজেই খেলা করেন মা যে নিজেই লীলা

করেন, ইহা যে সাধক একবার ধ্যানযোগে অনুভব করেন, তিনি যে সব তত্ত্বে মাকে দর্শন করিয়া মাকে উপলব্ধি করিয়া মাকে পাইয়া মায়ের অভয়-কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়া মায়ের অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বাস্বাদনে বিভোর হইয়া যান। দোল তো সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাহা দেখে কে? সাধারণ তত্ত্বের বিশেষ প্রকাশ ব্যতীত জীব যে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ নয়। সর্ব্বব্যাপী উষ্ণতা অসাধক আর কি করিয়া বুঝিবে? তাহার বিশেষ প্রকাশ যে অগ্নিকুণ্ড, তাহার সাহায্যে সে আস্তে আস্তে উহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। এইজন্যই বোধ হয় অবতারের ভিতর দিয়া সৎগুরুর ভিতর দিয়া ভগবৎতত্ত্ব আস্বাদ করিবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ ভাব বিশেষ দিন, বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধির সহায়।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি। প্রকৃতি দেবী তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-রসে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছেন। সাধক-ভক্ত তাই আজ এই বাহিরের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে ভাবসমাধিতে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার ভিতরকার সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যও যেন প্রকৃতির তালে তালে নাচিয়া উঠিল, বিকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। বাসন্তী পূর্ণিমার রজনীতে সাধকদের যাবতীয় সদ্ভাব যেন ষোলকলায় পূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, প্রতিতত্ত্বে অনু-প্রবিষ্ট অনুস্যূত মদনমোহন রসিকশেখর আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ আর কি তখন লুকাইয়া থাকিতে পারেন? সেই

চোরাগ্রগণ্য পরম পুরুষ আজ স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিতে বসিয়াছেন। তাই তো জীব ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে প্রতি-তত্ত্বে তাঁহার লীলা দর্শন করিয়া তাঁহার রসতত্ত্ব আস্বাদ করিয়া চরম তৃপ্তি লাভ করিতে জীবন সার্থক করিতে ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিতে এত ব্যগ্র। যে পরম তত্ত্ব একদিন অচল অটল নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত ছিল, লীলাচ্ছলে তাহাই যে আজ ভিতর-বাহিরের প্রতি তত্ত্বে আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু লীলারস বিস্তারের জন্য হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিজে না দুলিলে তাঁহাকে দোলায় কাহার সাধ্য? এইভাবেই তো তিনি তাঁহার প্রিয়তম জীবসমূহের কাছে ধরা দেন, তাহাদের সহিত লীলারস আস্বাদ করেন। সেই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়-তত্ত্ব যে কতরূপে কতভাবে আমাদের কাছে আপন মহিমা প্রচার করিতে বসিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হৃষীকেশ আমাদের প্রতিতত্ত্বে ভাবপ্রবাহের মধ্য দিয়া অন্তর্য্যামীরূপে কি কম দোল খাইতেছেন? সখা ও গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া সারথি-রূপে তাঁহার যে কত দোল খাইতে হইয়াছিল, কর্ম্মযোগের সাধক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যশোদার দুলাল-রূপে মা যশোদার বক্ষোপরি এবং গোপীজনবল্লভ শ্রীরাধার প্রাণগোবিন্দরূপে রাসক্ষেত্রে এমন ভাবে দুলিতে আরম্ভ করিলেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তখন

ব্রহ্মাণী: **লক্ষ্মী** ও শিবানী সহিত সেই তালে তাল মিলাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের **স্পন্দন-তত্ত্ব,** বৈদিক ঋষির ছন্দোরহস্যও নাকি সেই নৃত্যের মহিমাপ্রচারে নিত্য নিরত। লীলার ছলে তিনি এমনভাবে জীবের নিকট আপনার হইয়া পড়িলেন, যাহা দেখিয়া রসিক কবি তাঁহার মুখ দিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" আদি কথা বাহির করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। ভগবান বুদ্ধের সন্ন্যাস, শঙ্করের প্রচার, চৈতন্যের মহাবিরহ, যীশুর আত্মদান, মহম্মদের জীয়ন্ত উৎসাহ এবং এই যুগে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আদি দোললীলা চিন্তা করিতে গিয়া সাধক-ভক্তের হৃদয় যে ভাবে দুলিতে আরম্ভ করে, তাহার তাল সাম্‌লানও যে সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

হে সাধক, হে ভক্ত! একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম-তত্ত্ব ভক্তহৃদয়ে বৃন্দাবন-ধামে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের ভাবপ্রাবল্যে কেমন সুন্দরভাবে রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর ভুবনমোহনরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। নিত্যতত্ত্বে যিনি অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্বরূপে সর্ব্বভূতান্তরাত্মাভাবে বিরাজমান, নৈমিত্তিক প্রকট লীলায় তিনিই আজ কি সুন্দর ভুবনমোহনরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের বিচিত্র প্রেমতরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। তাঁহার প্রিয়তমা গোপীরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের পাঁচটি পিচকারী দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত

ভাব শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া যাবতীয় তত্ত্বের ভিতর দিয়া জীবের ভিতর দিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদি-মন্দিরে কি সুন্দরভাবে হিন্দোলনঅনুষ্ঠান আস্বাদ করিতে বসিয়াছেন। সাধক-ভক্তের গানে দেখিতে পাই মন-পবনে নাকি সেই দোলনা দুলিতে থাকে। যোগীগণ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রাণবায়ুর স্পন্দনের ভিতর দিয়া এই দোলতত্ত্ব আস্বাদ করেন। বাস্তবিকই যে অব্যক্ত অচিন্ত্য ভগবৎতত্ত্ব প্রেমরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আজও যে গোবিন্দদেব ইন্দ্রিয়রূপ গোসমূহের সাহায্যে ভক্তহৃদয়ে মনোবৃত্তিরূপ সখীসকাশে বিচিত্রভাবে দুলিতেছেন—যার নয়ন আছে সে দেখে, যার মন আছে সে-ই অনুভব করে।

এই লীলাঅনুভূতির সহায় "বুড়ী পোড়ান"রূপ অনুষ্ঠান। যাবতীয় কামনাবাসনাআসক্তিগুলিকে বীজ সমেত একত্র করিয়া জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে জ্বালাইয়া দিয়া অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে যে শ্রীভগবানের দোললীলা দর্শন করা যায় না। এই অগ্নিকাণ্ড হোলিলীলার প্রধান অঙ্গ। হোড়া বা হোলিকা অসুর শিবের কাছে বর লাভ করিয়া যখন অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, কামের অসৎব্যবহারে জীব যখন প্রপীড়িত হইতে থাকে, ছেলেরা ব্রহ্মচারীরা তখন সংযমাগ্নির সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের পূর্ণানুষ্ঠান দ্বারা ভগবৎকৃপায় গুরুর উপদেশে এই

অসুরকে বধ করিয়া জীবের প্রচুর কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করে। দাক্ষিণাত্যে এই অগ্নিকাণ্ড শিবের মদনভস্মরূপে সুপরিচিত। কামকে সংযত করিয়া প্রেমে পরিণত করিয়া তুলিতে না পারিলে যে আনন্দময়ের লীলারহস্য অনুভব করা যায় না, তাহা ধ্রুব সত্য। দেশ-বিশেষে পুতুনাকে কামপ্রবৃত্তিকে এইভাবে দাহন করিবার প্রথাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র-দেশে এইভাবে আগুনের সাহায্যে কামকে যাবতীয় কুভাবগুলিকে দাহন করিয়া চিত্তকে ভগবৎপ্রেমরঙ্গে রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে যাবতীয় দ্বেষভাব প্রাচীন শত্রুতা এই আগুনে দগ্ধ করিয়া পরস্পর আনন্দানুভূতির চেষ্টা করা হইত। আজকালকার অনুষ্ঠান-গুলি দেখিলে আর এই লীলার অভিনয়ে কাহারও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। আসল কথা, আনন্দময়ের রাসলীলা দর্শন করিবার সাধ থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে যাবতীয় কামনা বাসনা আদি কুভাবগুলিকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা জ্বালাইয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইলে তখন ভিতর হইতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। তখন সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের বিচিত্রভাবে অবস্থান কার্য্যকলাপ ভক্তহৃদয়ের অপ্রাকৃত চঞ্চলতা হেতু দোলনলীলা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীব পরম সার্থকতা লাভ করে।

রাসলীলা

রস শব্দ হইতে স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া রাস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রস কি তাহা লইয়া অনেক বিচার করা হইয়াছে—'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ' যাহা কিছু আস্বাদ করা যায় তাহাই রস। অম্ল-মধুর আদি রসগুলি জিহ্বার সাহায্যে অনুভববেদ্য হইয়া আমাদের আনন্দ বিধান করে। সমস্ত আনন্দের মূল কারণ আমাদের শ্রীভগবান, তিনি যে আনন্দময়—তাঁহাকে আমরা নানারূপে নানাভাবে আস্বাদ করিয়া থাকি। তাঁহারই আনন্দের কণা মাতাপিতা ভাইবন্ধু স্বামীস্ত্রীর ভিতর দিয়া ক্ষরিত হইয়া সংসারকে মধুর করিয়া তোলে, তাঁহারই আনন্দ-কণা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইয়া আমাদের আনন্দ বিধান করে। সাধকগণ ঋষিগণ দেখিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমাদের সেই পরমাত্মা শ্রীভগবান পরম রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। তিনি রস-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ না হইলে কে-ই বা চেষ্টাশীল হইত, কে-ই বা বাঁচিয়া থাকিত, "কো হ্যেবান্যাৎ কো বা প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"? আমরা সংসারে সেই রসের একটা আভাস পাই মাত্র। সেই রসটি এমন তত্ত্ব যাহা লাভ

করিলে আস্বাদ করিলে লোকে আনন্দস্বরূপ পূর্ণতৃপ্ত অমৃত-স্বরূপ হইয়া যায়, সংসারের ভয়-ভাবনা তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি তৃপ্তীভবতি অমৃতীভবতি, অথাসৌঽভয়ং গতো ভবতি"। সেই রসের প্রকৃত স্বরূপ বাক্য-মনের অগোচর অব্যক্ত অচিন্ত্য, যদিও তাহার বিকাশ প্রকাশ লীলাভাব কতক পরিমাণে আস্বাদ্য অনুভববেদ্য।

বেদ বলেন, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য আপন মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎরূপে পরিণত ও বিবর্ত্তিত হন। রসশাস্ত্র বলেন, পরম রসিকশেখর শ্রীভগবান আপনার লীলাবস্তারের জন্য যোগমায়ার সাহায্যে লীলাতত্ত্বের মধ্য দিয়া আপনাকে আস্বাদ্য অনুভববেদ্য করিয়া তুলিবার জন্যই রাসলীলার অনুষ্ঠান বা অভিনয় করিয়া থাকেন। তিনি একা, তাই আস্বাদ করিবেন কি করিয়া—কাহাকে? তার পরে শুধু নিজে খাইয়া তো আর তৃপ্তি হয় না, অপরকে প্রিয়জনকেও খাওয়াইতে হয়; কিন্তু তিনি খাওয়াইবেন কাহাকে? "দ্বিতীয়াঽভাবাৎ"—তিনি ছাড়া আর যে দ্বিতীয় কেহই নাই। এই জন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন, মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। যিনি ছিলেন এক, তিনি হইলেন বহু; নিজেকেই ছিন্নমস্তার ন্যায় দ্রষ্টা-

দৃশ্য-দর্শন, ভোক্তা-ভোগ্য-ভোজনাদিরূপে বহুভাবে পরিণত বা বিবর্ত্তিত করিলেন। আরম্ভ হইল অবিভক্তের বিভক্তি, একের বহুত্ব। এই অসম্ভব কার্য্যটাকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন হইল অঘটন-ঘটনপটিয়সী যোগমায়া দেবীর,—যিনি শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়াও শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ কল্পনা করিয়া এককে অনন্তরূপে অনন্তভাবে বিভক্ত করিয়া লীলারস বিস্তার করিতে সমর্থ। নির্গুণের সগুণভাব, নিরাকারের সাকারভাব, একের বহু-ভাব, অব্যক্তের ব্যক্তিত্ব,—এ সব যে বড়ই গোলমালের কথা! তাই তো ভগবানকে বলা হইল মায়াবী। তাঁহার মায়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে রজ্জুকে সর্পরূপে ব্রহ্মকে জগৎরূপে প্রতীয়মান করিতে সমর্থ।

তবে কি এই সব একান্তই মিথ্যা? বাস্তবিকই এই সব মিথ্যা হইত যদি ইহাদের সঙ্গে তাঁহার যোগ না থাকিত, যদি এই সৃষ্টির মধ্যে লীলার মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান না থাকিতেন। তিনি যাহার মূলে, তাঁহাকে লইয়া যাহা কিছু, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে—না বন্ধনের কারণ হইতে পারে? তাই তো সৃষ্টিটা রাসটা একান্তভাবে মিথ্যা কুহক প্রবঞ্চনা নয়—এ সব যে তাঁহারই বিকাশ তাঁহারই লীলা। তিনি নিজেই যে জগজ্জীবরূপে বিবর্ত্তিত পরিণত হইয়া এই খেলার অভিনয় করিতে বসিয়াছেন। আমাদের এই

জগৎটা যোগমায়ার খেলা হইলেও জীব যখন তাঁহার সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে ভুলিয়া যায়, তখন সে ইহাকে মায়ার খেলা মনে করে। যোগমায়ার খেলাটা অপ্রাকৃত, তাই সিদ্ধ-মহাত্মা ছাড়া কোনও প্রাকৃত জীব এই লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিতে সমর্থ নয়; সাধক ছাড়া অন্যে এই তত্ত্ব ধারণায়ও আনিতে পারে না। রাসটা আনন্দ-লীলা—রসরাজ ও মহাভাবের শক্তিমান্ ও শক্তির একটা অপূর্ব্ব আনন্দরসাস্বাদন-তত্ত্ব। ইহার ক্ষেত্র অপ্রাকৃত আনন্দ-চিন্ময়-রস-পরিভাবিত শ্রীবৃন্দাবনধাম, কাল শারদী পূর্ণিমা তিথি, পাত্র সাক্ষাৎ রসিকশেখর শ্রীমদনমোহন ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণবিকাশ গোপীবৃন্দ, উদ্দেশ্য মর্ত্তধামে স্বর্গরাজ্যকে আনয়ন করিয়া জীবকে অপ্রাকৃত লীলারসআস্বাদনের ভিতর দিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিয়া আস্তে আস্তে প্রকৃত গোলোকধামের অধিকারী করিয়া তোলা।

ভগবান বুদ্ধের সাধনা জীবকে সাধককে 'নেতি' 'নেতি' সাধনা দ্বারা পবিত্র ও অপ্রাকৃত করিয়া তোলা, শঙ্করের সাধনা বিচার দ্বারা ইতিতত্ত্ব ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, যীশুর সাধনা মর্ত্তবাসীর নিকট স্বর্গের বার্ত্তা আনয়ন করা, চৈতন্যের সাধনা বহিরঙ্গ সাধককে অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা আর অন্তরঙ্গ সাধককে রসতত্ত্ব আস্বাদনে সাহায্য করা; তাইতো মহাপ্রভু রাসরসে এমন মাতোয়ারা,

রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণরূপ রসরাজ ও মহাভাবের যুগল মূরতি।

রাসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর মায়া ও যোগমায়ার সৃষ্টির ভিতরে কোথায় কিরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা অনুভব করিবার জন্য সাধনা কর। তারপরে জীবতত্ত্ব গোপীতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লইয়া সমাধিমগ্ন হইয়া যাও, জীবের ভাগ্যে কোন্ অবস্থায় রাস-তত্ত্ব আস্বাদনের অধিকার জন্মে ধ্যাননেত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা কর। ঋষিপত্নীগণ কেন যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে চিত্তে দেহ-গেহের স্মৃতি থাকিতে, আমি-আমার জ্ঞান থাকিতে, জগদ্ধর্ম্মের সংস্কার থাকিতে এতত্ত্ব আস্বাদ করিবার উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে সখ্যভাব লাভের জন্যও একদিন অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিত্যসিদ্ধা স্বরূপ-শক্তি গোপীগণের পর্য্যন্ত বস্ত্রহরণ-লীলা সংস্কারাবরণ দূর না হইলে এই পবিত্র রাসতত্ত্ব আস্বাদ করিবার অধিকার জন্মে নাই। মনে রাখিতে হইবে চিত্তের কামভাব সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার জন্যই রাসলীলার অভিনয়, একথা স্বয়ং শ্রীশুকদেব বলিয়া গিয়াছেন; আর আদর্শ পবিত্র প্রেমিক মহাপ্রভু এই রাসলীলা লইয়াই সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন।

অন্য ব্যাখ্যায় 'নেতি' 'নেতি' সাধনার ফলে লয়যোগের

পরাকাষ্ঠা অবস্থায় সমাধিদশায় প্রকৃতিরাজ্যের সব ভাব সব সংস্কার চলিয়া গিয়াছে, জগতের সব তত্ত্ব শূন্যে পরিণত হইয়াছে; ইহার পরে একএক কলা করিয়া অপ্রাকৃত ভগবৎতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভক্তহৃদয়ে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, বস্ত্রহরণ-লীলার ফলে ভক্তের সব আবরণগুলি মায়ার চাদরগুলি খুলিয়া গিয়া তাহাদের দিব্য-দর্শন লাভ হইয়াছে। তখন সেই ভাবরাজ্যের পূর্ণ-বিকাশে সব তত্ত্বের পূর্ণ পরিণতিলাভে ভক্তহৃদয় মদন-মোহনের আবির্ভাব ও লীলার প্রশস্ত ভূমি হইয়া পড়িল। সাধারণভাবে তিনি নিত্য সর্ব্বগত হইলেও বিশেষভাবে তাঁহার প্রকাশলীলা বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই অনুভূত হইয়া থাকে। নিত্যভাবে যিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি আনন্দরূপমমৃতং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রসস্বরূপ, নৈমিত্তিক-ভাবে তাঁহারই পূর্ণ বিকাশ পূর্ণ অবতার যিনি—তাঁহাকে লইয়াই আমাদের কৃষ্ণতত্ত্ব। যে তত্ত্ব বাক্য-মনের অগোচর ছিল, তাহাই কৃষ্ণতত্ত্বরূপে যেন কতকটা অনুমেয় ও আস্বাদ্য হইয়া পড়িল। এই পরমতত্ত্বের স্বরূপশক্তিকে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে ত্রিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সৎস্বরূপা সন্ধিনী শক্তি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে নিযুক্তা, চিৎস্বরূপা সম্বিৎ শক্তি জ্ঞানীর আরাধ্য-দেবতা, আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তি ভগবৎ-আনন্দবিধানে রাসলীলার পুষ্টিসাধনে আদিষ্টা। গোপীগণ এই হ্লাদিনী শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, কৃষ্ণসুখ-

বিধানে তৎপরা—"কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য"। শ্রীরাধারাণী প্রেমের সর্ব্বপ্রধান সারতত্ত্ব মহাভাবস্বরূপা, গোপীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—গোপীগণকে ইহাঁর কায়াব্যূহ বলা হইয়া থাকে। পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র সব তত্ত্বে বর্ত্তমান থাকিলেও বিশুদ্ধ ভক্তহৃদয়ে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামেই তাঁহার সমধিক প্রকাশ।

জীব মাত্রই পরমাত্মাকে আচ্ছাদন ও ধারণ করার জন্য গোপীভাবাপন্ন এবং ভগবৎলীলার অল্পাধিকভাবে সহায় হইলেও নিত্যসিদ্ধ সখীগণই সাধারণতঃ গোপী বলিয়া পরিচিতা। "গোপায়তি আত্মানং পরমাত্মানং যা সা গোপী, নতু স্তনকেশবতী" কথাটি বুঝিতে চেষ্টা কর। গোপী হইতে হইলে যে স্ত্রীলোক হইতে হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। চৈতন্যলীলায় অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস আদিকে গোপীভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ গো-শব্দের অর্থ গরু, যাহারা প্রকট লীলায় ননীমাখনপ্রিয় বাল-গোপালকে আদর করিবার জন্য সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোচারণ গোপালন-কার্য্যে সুদক্ষা ও নিযুক্তা তাহারাই গোপী। তাহার পরে গো-শব্দর অর্থ ইন্দ্রিয় আর তাহাদিগকে যাঁহারা পালন করেন—সংযম দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ভগবৎসেবায় ভগবৎআরাধনায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিয়া বিশেষভাবে ভগবৎলীলার সহায় হন, তাঁহারাও গোপী; গো-শব্দের অর্থ আবার বেদ। সমস্ত জ্ঞানই

এই বেদের অন্তর্গত হইলেও যে জ্ঞান ভগবৎতত্ত্বকে ভগবৎলীলাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করে, সেই জ্ঞানের সারভূত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান রসতত্ত্ব আনন্দ তত্ত্বকে যিনি রক্ষা করেন ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করেন তিনিও গোপী। এই সব গেল পণ্ডিতদের কথা। আমাদের মতে যাহার কারণ-শরীর অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের সার প্রেমরসে ভরপুর, যাহার সূক্ষ্ম শরীর সংযত শুদ্ধ ও শান্ত, যাহার স্থূল শরীর প্রকট কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত তিনিই গোপী; এইভাবে একটা সমন্বয়সাধনের দিকেই আমাদের দৃষ্টি। যিনি ভগবানকে পাইয়া তাঁহা ছাড়া আর কিছুই দেখেন না শোনেন না ভাবেন না জানেন না, অন্য কিছুর জন্য যাঁহার কোনও রাগ আসক্তি বা উৎসাহ দৃষ্ট হয় না "ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি" কৃষ্ণচন্দ্রই যাঁহার যথাসর্ব্বস্ব—তাঁহাকে লইয়া যিনি সর্ব্বদা লীলাতৎপর, সেই আত্মক্রীড় আত্মরতি আত্মমিথুন ভগবৎসেবাপরায়ণ সিদ্ধ-মহাত্মাগণই প্রকৃত পক্ষে গোপীপদবাচ্য। এই গোপীপ্রেমের সারভূতা মহাভাবস্বরূপিণী কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণসর্ব্বস্বা কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণের পরমবাঞ্ছিতা, রাসেশ্বরী দেবীই আমাদেরই শ্রীশ্রীরাধারাণী।

স্থানমাহাত্ম্যে কালমাহাত্ম্যে ভক্তভগবানের পূর্ণ আবির্ভাবে সমস্ত তত্ত্বগুলির পূর্ণ বিকাশে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ভক্তহৃদয় আজ আনন্দরসে ভরপুর। গোপীগণ সাধকগণ

শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য সেবার জন্য লালায়িত, তন্ময়ভাব-প্রাপ্ত ; এমন সময় বাজিয়া উঠিল তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মময় মোহন বাঁশরী ; -সেই অনঙ্গবর্দ্ধন প্রেমরসের পূর্ণ উদ্দীপন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎআহ্বান—কাতর-ডাক ; তখন সেই বেনুরব গোপীদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। সব ছাড়িয়া সব ভুলিয়া গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় গোপীচিত্ত চলিল আজ কৃষ্ণাভিসারে—সে গতিকে বাধা দেয় কাহার এমন সাধ্য ?

স্থূল দেহ অবরুদ্ধ হইলে তখন সূক্ষ্ম দেহ কিভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হয়, ভাগবতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সব তত্ত্বগুলি যখন ভগবৎঅভিমুখী হয় তখন জীবাত্মা সব ছাড়িয়া কি করিয়া কিভাবে পরমাত্মার দিকে ধাবমান হন, গোপীদের অভিসার-তত্ত্বের কৃষ্ণান্বেষণ-রহস্যের মধ্য দিয়া সেই তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মর্ত্ত-জগতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে চুম্বকের সম্মুখে পবিত্র লৌহখণ্ডের কিংবা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পতঙ্গের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। ইহাদের গতির জন্য অভিসারের জন্য মিলনের জন্য যদি কেহ দায়ী হন তবে তিনি স্বয়ং বিধাতা, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীভগবান—জীবে আর কি করিয়া সেই তত্ত্ব ধারণায় আনিবে, তাহার কর্ত্তব্যঅকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে বসিবে ? রসোৎকর্ষের সময় শ্রীভগবানের তিরোভাব, গোপীদের

কৃষ্ণান্বেষণ,জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন, নিজের ভিতরে কৃষ্ণের অনুভূতি, অপর সকল তত্ত্বের বিস্মরণ, ভগবানের আবির্ভাব প্রভৃতি তত্ত্বগুলি বহু কাল ধরিয়া ধ্যানে উপলব্ধি করিতে না পারিলে রাসতত্ত্ব আস্বাদ করা যায় না। নিত্যলীলায় সাধক ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে নিজের ও জগতের প্রতি তত্ত্বে ভগবৎসত্তা ভগবৎ-বিকাশ ভগবৎলীলা-রহস্য কিভাবে আস্বাদ করেন এবং নৈমিত্তিক প্রকট লীলায় সেই ভগবান যখন রূপেগুণে জ্ঞানে-প্রেমে আনন্দে ও আকুলতায় ভরপূর হইয়া জগতের জীব-সকাশেই আবির্ভূত হন অবতীর্ণ হন, সখারূপে গুরুরূপে পুত্ররূপে পতিরূপে সাধকের নিকট ধরা দেন, তখন সেই সাধকরূপ আরাধিকার সহিত পতিভাবে আগত শ্রীভগবানের রসলীলা আনন্দ-আস্বাদন-তত্ত্ব লইয়াই তো বৈষ্ণব সাধকগণের রাসতত্ত্ব। নিত্যভাবে ভক্তহৃদয়ে এই লীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে, নৈমিত্তিকভাবে সময় বিশেষে এই মর-জগতে সেই অপ্রাকৃত রাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। প্রকৃত সাধক নিত্য স্বকীয় হৃদয়ে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া এই লীলার আস্বাদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, শারদী পূর্ণিমা তিথিতে উদ্দীপন বিভাবের সাহায্যে রসগ্রাহী ভাবুক ভক্তসহ এই রস আস্বাদ করিতে সচেষ্ট থাকেন। বলা বাহুল্য যিনি নিজে রোজ আপনার ভিতরে এই লীলা আস্বাদ করেন, তাঁহার দ্বারাই তিথিবিশেষ এই লীলার আস্বাদ ও প্রচার-কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইরা থাকে। শুকদেব বলেন, রাসলীলা জীবকে

স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য, জীবকে তাহার সেই আনন্দ-ধামের তাহার সেই প্রাণারামের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। শ্রীধর বলেন, রাসলীলার অভিনয় জীবকে কামনা বাসনা আসক্তির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎতত্ত্ব আস্বাদ করাইয়া ভগবৎলীলা দর্শন করাইয়া অপ্রাকৃত সুখের পরিচয় দিয়া অপ্রাকৃত ভগবৎধামের জন্য একান্তভাবে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। সাধকের ইন্দ্রিয়জয়, বাসনাক্ষয়, অহংকারনাশ ভগবৎআকর্ষণ-বোধ, মায়াবরণভেদ ভগবৎ-দর্শন, অহংতত্ত্বের দর্পচূর্ণ, একান্ত আত্মনিবেদন-পূর্ণ রসাস্বাদন, ভগবৎতৃপ্তিবিধান, চরম পরিণতিপ্রাপ্তি, পূর্ণভাবে ভগবৎ-উপলব্ধি আদি সাধনের সমস্ত অঙ্গগুলি সমস্ত তত্ত্বগুলি এই রাসলীলার ভিতর দেখান হইয়াছে। এই রাসের নৃত্যই তো জগতের সর্ব্বত্র সবতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎকে এমন মধুর করিয়া তুলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের এই নৃত্যই তো ব্রহ্মাব্রহ্মাণীকে বিষ্ণুলক্ষ্মীকে রুদ্ররুদ্রাণীকে সমস্ত জীব-দম্পতিকে যুগলরূপে নাচিতে লীলারস আস্বাদ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। জগৎ যে আজ এত মধুর তাহা সেই পরম মধুরকে লইয়া, জগৎ যে আজ এত সরস তাহা সেই রসরাজ ও মহাভাবের রাসলীলার পরিণাম। জীব কি করিয়া আনন্দের মধ্য দিয়া সেই পরমানন্দের আস্বাদ পাইয়া শিবকে ধরিতে শিখিবে, কি করিয়া এই সংসারকে বৃন্দাবন-ধামে পরিণত করিয়া মর্ত্তে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত

দেখিবে, তাহার কৌশল আমরা রাসতত্ত্বে দেখিতে পাই। মনে রাখিতে হইবে পবিত্রচেতা শুকদেব ইহার বক্তা আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এই রসের ভোক্তা। আমরা তাঁহাদের একটু প্রসাদ পাইলে জীবন সার্থক মনে করিব।

শুধু তেজীয়ান্ বীর স্বরূপপ্রতিষ্ঠ সাধকই এই রসতত্ত্ব-বিচারে অধিকারী। রাসের খেলাকে শুকদেব ভগবানের নিজ শক্তির সহিত বিহাররূপে বর্ণনা করিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিলেন তাহাও মনে রাখা দরকার—"রেমে রমেশঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" বালক যেমন আয়নার নিকটে নিজের প্রতিবিম্ব লইয়া খেলা করে, আমাদের শ্রীবৃন্দাবনের বালগোপালটিও ঠিক তেমনি যোগমায়ার সাহায্যে নিজ প্রতিবিম্বরূপা গোপীগণ সহ লীলা করিয়াছিলেন। রাসে কামের নামগন্ধ নাই,—অনঙ্গকে মহাদেব ভস্ম করেন, তাহার পরে মদনমোহন তাহাকে নূতন জীবন দান করিয়া সেই কামকে প্রেমে পরিণত করিয়া তাহা লইয়া রাসলীলা করেন। প্রকৃত রাস সাধকদের মতে অনুষ্ঠিত হয় সিদ্ধ শরীরে চিন্ময়দেহে। বলা বাহুল্য, সাধক রাসতত্ত্বের ধ্যানের ফলে স্বামীস্ত্রীর ভিতরকার স্বকীয় কাম-ভাব দূর হওয়ায় তাহাদের ভিতরেও রসরাজ ও মহাভাবের বিলাসবিভূতি-দর্শনে সমর্থ হন। তখন তাঁহাদের তামসিক দেহের তামসিক ভাবের দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া ভিতরের আসল জ্যোতির্ম্ময় দেহের দিকে দৃষ্টি পড়ে।

—চিঠি—

জীবের প্রকৃত বাসস্থান শ্রীভগবানের সেই আনন্দধামে। জীব নিজেও শ্রীভগবানের ন্যায় নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবাপন্ন যে কারণেই হউক বলরামের মায়া দেখিতে যাওয়ার ন্যায় জীব এই সংসারে আসিয়া মায়ায় ভুলিয়া নিজের স্বরূপ ভগবৎস্বরূপ ভগবৎধামের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দুঃখে কষ্টে তাপে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমময় শ্রীভগবান আর কি করিয়া এতদিন তাঁহার প্রিয়তম জীবের দুর্দ্দশা দর্শন করিতে পারেন? তাই তিনি সময় সময় অনেক সাধু-মহাত্মাদিগের দ্বারা তাঁহার সে দেশের সংবাদ এদেশে প্রেরণ করেন, তাঁহার জীবগুলিকে ডাকিয়া পাঠান। জীব এমনই মায়ায় আবদ্ধ যে সে ডাক শুনিয়াও শুনে না, মহাত্মাদের কথা বুঝিয়াও বুঝেনা। এভাবে জগতের জীব যখন দুর্দ্দশার সীমায় গিয়া পৌঁছিল অসুরদের অত্যাচারে যখন দেবগণ বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইলেন, সাধুদের কাতর প্রার্থনা তখন ভগবৎধামে গিয়া শ্রীভগবানের কোমল প্রাণে এমন-ভাবে আঘাত করিল যে, তিনি তখন তাঁহার স্বধাম স্বপার্ষদগণ সহ মর্ত্তলোকে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হইল তখন তাঁহার গৌণকর্ম্ম; মর্ত্তে প্রেমরাজ্য-স্থাপন জীবকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিয়া তাঁহার আনন্দধামের উপযুক্ত করিয়া তোলা আনন্দধামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেখানে যাইবার জন্য প্রলোভিত করিয়া তোলা হইল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অবতরণের লীলাপ্রকটনের

মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব আমাদের এই রাসলীলা। শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎধামে শ্রীভগবান তাঁহার পার্ষদ সখাসখীগণ সহ কিভাবে আনন্দে লীলা করেন এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা সেই ভাবে কাজ করিয়া লীলা করিয়া জীবের সম্মুখে তাহার একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। সেই আদর্শ জীবন অবলম্বনে সেই আদর্শ লীলার সাহায্যে জীব আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া আনন্দধামের মধুরতা আস্বাদ করিয়া শ্রীভগবানকে পূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাসলীলা কুপথগামীকে সুপথে আনিবার জন্য, দুঃখকষ্টে পীড়িত প্রবাসী ব্যক্তিকে স্বদেশে স্ববাসে আনিয়া আনন্দরসে বিভোর করিয়া দিবার জন্য, স্বরূপবিস্মৃত জীবগণকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীভগবানের সেবার লীলার সহায় করিয়া তুলিবার জন্য। এই রাসলীলা জীবের পূর্ণপরিণতির ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়।

কৃষ্ণপ্রেম

তোমার এবারকার চিঠিখানি পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। কেন জান? তুমি কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনিতে চাহিয়াছ বলিয়া, আর তোমার চাওয়াটা যেন তোমার প্রাণের অন্তস্তল হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হওয়ায়। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা মাতোয়ারা করিয়া রাখুন। তোমার অবস্থা সেই "ওঁ তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি", "ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি", "ওঁ যজ্‌জ্ঞানাৎ মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি"র মতন হউক। "তদর্পিতাখিলচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা" এই সূত্রটী যেন ভগবান্ তোমাকে অনুভব করিতে দেন। আর কি বলি! ভাই, কৃষ্ণপ্রেমের কথা কি এই ভাবে বলা যায়? যে পর্য্যন্ত জগৎ বলিয়া একটা পদার্থের সংস্কার মনে থাকে, যে পর্য্যন্ত দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণাদির বৃত্তি চিত্তে বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত আমি বলিয়া জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেম যে চিন্তার অতীত। "ঐ তো মাধবী মূলে মাধব দাঁড়াইয়া ছিল, আমারে দেখিয়া আবার সে কোথায় লুকাইল"—

"আমারে" দেখিলে সে তত্ত্ব যেন কোথায় লুকাইয়া যায়। যদি ভগবান কখনও দিন দেন তবে সে সময় তোমার সঙ্গে একটু কৃষ্ণকথা কওয়া যাইবে। সে কিভাবে জান? শুধু একটু নমুনা বলিতে পারি,—কোনও প্রাকৃতিক রমণীয় স্থানে আমরা যাইব, যেখানকার গাছপাতা ফলফুল পাখীহাওয়া সব উদ্দীপন বিভাব হইবে—জোর করিয়া ভগবৎভাব ফুটাইয়া বাহির করিবে। যাহার ত্রিসীমানায় জটিলা কুটিলার প্রবেশনিষেধ, এমন একটী স্থানে বসিয়া আমার বুকে মাথা রাখিয়া তুমি প্রাণ খুলিয়া তোমার প্রাণের গান-গুলি গাহিতে থাকিবে; তুমি গাহিতে গাহিতে এবং আমি শুনিতে শুনিতে একেবারে বেহুস্ হইয়া এদেশ ছাড়িয়া সে দেশে—"যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখরে, তুমি মানে আমি বই আর কিছু নাই রে"—সে দেশে গিয়া, যখন সব সাকার নিরাকারে ডুবিয়া গিয়া সেই নিরাকার আবার অপ্রাকৃত সাকারভাবে—সচ্চিদানন্দবিগ্রহভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকিবে, তখন আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায় আপনা হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেম, সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ফুটিয়া বাহির হইবে। বৈষ্ণব সাধকগণ সমাধিযোগে অনুভব করিয়াছেন যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণলীলার সবই অপ্রাকৃত। গোপীগণ সখাগণ ধেনুগণ—এমন কি, বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সকলেই অপ্রাকৃত দেহধারী; সমস্ত সিদ্ধ-মুক্ত পুরুষেরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করিবার

জন্য স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তুমিই বল দেখি, এই পৃথিবীর লোকেরা কি সেই হাওয়া সহ্য করিতে পারে? সমস্ত ভাবগুলিকে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই পাঁচ ভাব ছাড়া জগতে কেহ কাহার সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না। ইহাদের সর্ব্ব নিম্নে ধরা হইয়াছে শান্ত ভাবটীকে। জিতেন্দ্রিয় আত্মারাম সিদ্ধ-মহাত্মাগণ, সনক সনন্দ সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এই ভাবে কৃষ্ণের সহিত সম্বদ্ধ। অপর ভাবগুলি ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ; সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, যাঁহারা অপর ভাবে কৃষ্ণাসক্ত তাঁহারা কত উচ্চদরের লোক। তাঁহাদের কাহারও দেহজ্ঞান আত্মসুখজ্ঞান আমিত্বজ্ঞান ছিল না বলিয়া কথিত আছে। মনে রাখিও, যাজ্ঞিক পত্নীগণ সংসারধর্ম্মের স্মৃতি থাকার জন্য আমিত্বের একটা ছায়া থাকার জন্য কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও কৃষ্ণসঙ্গসুখে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে কেন বঞ্চিতা ছিলেন, বস্ত্রহরণের পরেও কতদিন কি ভাবে সাধনার পরে গোপীগণ—নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন! মনে হয়, কোন যাত্রার দলের সব অভিনেতাগুলিই যদি সিদ্ধ আপ্তকাম হয়, সকলেই যদি স্বকীয় কার্য্যে আদর্শস্থানীয় হয়, তবে সেখানকার সকলেই তাহাদের অভিনয়দর্শনে ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারে। আপ্তকাম সিদ্ধপুরুষের প্রাণের ভালবাসা, হৃদয়ের টান,

সেবার আনন্দ, নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপালন জীবনে প্রত্যক্ষ করিলে কতকটা অনুমান করিতে পারিবে।

কৃষ্ণজীবনে এই পাঁচ ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখান হইয়াছে। শান্ত অবস্থায় সিদ্ধপুরুষগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন, যেন সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সাক্ষাৎ ব্রহ্মই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-ঘন মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছেন। জগতের যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব ইহাঁকে স্পর্শ করা দূরে থাক্, ইহাঁর নিকটেও অগ্রসর হইতে পারে না; ঠিক যেন উদাসীন—জাগতিকভাবের অনেক উপরে উঠিয়া বসিয়া আছেন। উদ্ধব নারদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বুঝিতে পারিতেন না যে, কি করিয়া এমন আদর্শ প্রভু জগতে আসিতে পারেন। সখাগণ পিতামাতাগণ গোপীগণ কি ভাবিতেন কি করিতেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুকদেবের মত মহাত্মা যে প্রেমের একবিন্দু অনুভব করিবার জন্য সর্ব্বদা ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে মানুষ আর কি বুঝিবে কি বর্ণনা করিবে? যদি রূপ গুণ প্রেম আদি যাবতীয় সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সার তত্ত্ব সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হন, তবে তখন কি অবস্থা হয় বলিতে পার কি? একটী ভাবেরও পূর্ণ আবির্ভাব বোধ হয় মানুষ সহ্য করিতে পারে না। সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ যেখানে জীবরূপে আবির্ভূত আর তাহাদের মাঝখানে যখন অমন একটী বস্তু সশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদেরে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত, তখনকার সেই ভাব সেই প্রেমলহরী

কি বর্ণনা করিতে পার ? চৈতন্যদেব তো তাঁহার নাম শুনিয়াই পাগল অবসন্ন ও সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে আত্মসুখলাভেচ্ছা সে সময় সে দেশে স্থান পাইত না। "হামে না পেখিয়ে রাই কৈছে জীয়ব, ইথি লাগি বিদরে পরাণ।" এই গানটী অনুভব করিতে চেষ্টা কর।

বেদের সার ভাগ এবং তাহার টীকাস্বরূপ ষড়্‌দর্শন, তাহার দৃষ্টান্ত সহ ভাষ্যস্বরূপ ঋষিপ্রণীত পুরাণগুলি সাধনলব্ধ বিচার-চোখে পর্য্যালোচনা করিয়া সাধকচূড়ামণি শুকদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভগবৎস্বরূপ, জীবের স্বরূপ, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধবিস্মৃতি এবং পুনঃ উপলব্ধি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। সেই সূক্ষ্মভাবে স্থিত ভগবৎস্বরূপগত ভাবরূপ বীজ হইতে ফুলে ফলে সুশোভিত যে সকল বৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের জীবনী বা লীলা নিয়াই ভাগবতকার একটু বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মনে কর, ভগবান হইতে জীব পর্য্যন্ত যেন একটী রাস্তা আছে আর অধিকারীভেদে যেন সেই রাস্তায় সিদ্ধ ও সাধক মহাত্মাগণ বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একএকটি যেন একএক তত্ত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি বা বিগ্রহ। আমরা অন্ধকারে বসিয়া বা দৃষ্টিশক্তির অভাবে যেন তাহা দেখিতে পাইতেছি না এবং সেজন্য মানিতেও রাজি নই। হঠাৎ যদি কোন অলৌকিক মহাত্মা আসিয়া অর্জ্জুনকে দিব্য-চক্ষু দেওয়ার মত কোন একটী আলো সম্মুখে ধরেন—

আমাদের দিব্য-চক্ষু দান করেন, বলতো, তখন আমাদের কি অবস্থা হয় ? সে সময় জগতের অতীত রাজ্যে গোলোকে অপ্রাকৃত দেশে অবস্থিত জীবগণের স্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ এবং ভগবৎস্বরূপ যদি আমাদের ধারণায় আইসে (কারণ সে দৃশ্য অর্জ্জুনেরও অসহ্য হইয়াছিল), তবে তখন কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণপ্রেম যে কি পদার্থ তাহা আমরা কতকটা অনুভব করিতে পারিব। প্রাকৃত চক্ষু তাহা দেখিতে পারে না, প্রাকৃত মন তাহা কল্পনায় আনিতে পারে না। সে যে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" 'শুধু তুমি জানাও যারে সেই জানে'।

কৃষ্ণপ্রেম বুঝিতে হইলে জিতেন্দ্রিয় জিতমন নিঃস্বার্থ হইয়া 'আমি'কে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা কর আর ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা কর। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়, অনর্থ নিবৃত্তি হলে প্রেমের উদয়।" চৈতন্যদেবের এই উক্তিটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে। 'অনর্থ' কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যাহা অর্থ পরমার্থপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, যাহা সেখান হইতে জোর করিয়া প্রাণকে টানিয়া লয় তাহারই নাম অনর্থ। আর ভগবৎপ্রেম ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ, সাধন জন্য নহে। জীবের এমন শক্তি নাই যে তাঁর কৃপা ব্যতীত সে প্রেম লাভ করে। অনেক দিন পূর্ব্বে ভাবিতাম, ভাগবতাদি-গ্রন্থ গোপীপ্রেম নিয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। এখন কি মনে হয়

জান ? সেই আসল প্রেমের কোটি অংশের এক অংশও যেন ভাগবতকার কাগজে কলমে বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

রাজা পরিক্ষিত গোপীচরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করায় শুকদেব প্রথমে একটী জবাব দেন "তেজীয়সাং ন দোষায়"—বীরের পক্ষে সিদ্ধ গোপীদের পক্ষে সে সব দোষের কারণ নয়। মনে কর আমার অসুস্থ শরীরে অসুস্থ মনে যাহা অনিষ্টকারী, একজন সুস্থমন ব্যক্তির পক্ষে তাহা অনিষ্টকারী নয়; যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে এমন কাজ করিতে গেলে তাহাকে আর তেজী (বলিষ্ঠ বা বিচারবান্) বলা যায় না। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নিকট আবরণের যতটা প্রয়োজন, পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়ের নিকট কখনই ততটা প্রয়োজন হইতে পারে না। শীত লাগিলেই তো গায়ে কাপড় দিব, শীত না লাগিলে গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করা কষ্টের কারণ বলিয়া মনে হয়। এইভাবে অনেক বুঝাইয়া পরে কি বলিয়াছেন জান ? 'কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ' কৃষ্ণকে দেখিলে তাঁহার কথা মনে করিলে, মানুষের কথা কি বলিব, মন্মথের পর্য্যন্ত মন মথিত হইত; ভগবৎভাবে ভাবিত হইলে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। যেখানে নিজ নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়, সেখানে শারীরিক ঐন্দ্রিক বা মানসিক বৃত্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি ? প্রকৃত সাধক ব্যতীত গোপীতত্ত্ব অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। তাহারা যে সব "আপন-ভোলা পাগল-

পারা"র দল। পার্থিব আচার-ব্যবহার বা শাসনপদ্ধতি দ্বারা সেই স্বর্গীয় দেবতাদেরে বাঁধিয়া রাখিতে যাওয়া যেন বিশেষ অপরাধের কথা মনে হয়। সে রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রকমের; তাঁহারা মুক্তজীব, চোর-ডাকাতের থাকিবার উপযুক্ত এই জেলখানায়—আমাদের সীমাবদ্ধ বিধান-গুলিতে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিবেন কেন? আর কাহারই বা এমন শক্তি যে এখানে তাঁহাদেরে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। সেই প্রেমের কথঞ্চিৎ আস্বাদকারী মীরাবাই প্রভৃতির জীবন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। * *

বিষয়টী বড় মধুর। কৃষ্ণপ্রেম কথাটী তিন ভাবে নিষ্পন্ন —কৃষ্ণের প্রেম কৃষ্ণে প্রেম, এবং কৃষ্ণই প্রেম। কৃষ্ণের প্রেম যে কি পদার্থ তাহা কৃষ্ণই জানেন, প্রেম দিয়াই যাঁহার শরীরটী গড়ান হইয়াছে, প্রেমই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রেম কি বর্ণনা বা অনুভব করা যায়? সে যে "মূকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয়ং স্বয়মেব তত্ত্বং স্বয়মেব বোধ্যং"। উপনিষদ সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি স্তব্ধীভবতি অমৃতীভবতি"। কৃষ্ণ সেই রসরাজ-শিরোমণি। সাধকগণ সুধা ছানিয়া চাঁদ নিঙাড়িয়া সে রূপ গড়িতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। "সূর্য্য-কোটিপ্রকাশঞ্চ চন্দ্রকোটিসুশীতলম্" প্রভৃতি কতরূপেই সেই রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে যে "রূপ হেরি আঁখি মোর পুন নাহি লোটই মন অনুগত নিজ লাভে।

অপরশ দেই পরশ সুখ সম্পদ শামরু সহজ স্বভাবে। পীরিতি মুরতি বর দাতা প্রতি অঙ্গ অখিল অনঙ্গ সুখসায়র নায়রে নিরমিল ধাতা (না জানি কত যতন করে) (বিরলে বসিয়া বিধি) (বুঝি দেখে নাই দেখে নাই) (বিধি হেরিলে আমার মতন হত)। লীলা লাবনী অবনী অলঙ্করু কি মধুর মন্থর গমনে। লোহু অবলোকনে কত কুলকামিনী সুতলি মনসিজ শয়নে। সহজ স্বভাব ভাব রস ভাবিতে সঁপিল তনু মন চরণে। গোবিন্দ দাস কয় তবে জানি কিবা হয় যবে হবে তনু তনু মিলনে।" এই সঙ্গে "রূপে ভরল দিঠি" এবং "রূপ লাগি আঁখি ঝরে" গান-দুটী যোগ করিবে। "হে হরি সুন্দর কত রূপ কত শোভা একাধারে ধর; তোমার হাসিতে হাসিছে জগৎ, মার কোলেও শিশু সেই হাসি হাসে; পুণ্যবতী সতী বদনে যে জ্যোতিঃ, তোমারই সে জ্যোতিঃ হে জ্যোতির জ্যোতিঃ, তোমারই শোভায় কিবা শোভাময় ভকত হৃদয়কন্দর।"

একাধারে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার, এমন কি—জীবের জীবত্ব পর্য্যন্ত যাহাকে দেখিলে যাহার নাম শুনিলে আত্মহারা হয়,—কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণপ্রেম সেই জিনিস। সে রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে। তাই বৈষ্ণব-কবিগণ কৃষ্ণপ্রেমকে 'রূপপঙ্ক' বলিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্ আরো বলেন—"এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি", "তারতম্যেন বর্ত্তন্তে ব্রহ্মানন্দলবাশ্রয়াঃ" জগতে যত কিছু

সৌন্দর্য্য যত কিছু আনন্দ দেখ, এ যে সেই কৃষ্ণানন্দের কৃষ্ণ-প্রেমের কণা বা ছায়া মাত্র। তিনি জগতের ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছেন, আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইলে আস্তে আস্তে ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবেন। ভাই, কৃষ্ণ যে কি পদার্থ তাঁহার প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা আমি বলিতে পারি না; বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে একখানি পুস্তক আছে, উহা একবার পড়িয়া দেখিও। কৃষ্ণপ্রেম যে কি পদার্থ তাহা সাধকদের অবস্থাদর্শন এবং অনুচিন্তন ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাহার সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সাধকপ্রাণে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের ন্যায় কত রকমের বৃত্তির উদয় হয় এবং সেই বৃত্তিরূপা ঢেউগুলি কতদূর অবধি উঠিতে পারে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সেই প্রেম-যমুনার ঢেউগুলি কি বর্ণনা করা যায়? এবিষয়ে জানিতে হইলে বড় বড় সিদ্ধ-মহাত্মাগণ গোপীপ্রেম অনুচিন্তন ও ধ্যান করিতে বলিয়া গিয়াছেন। সাধকচিত্তরূপ প্রশান্ত মহাসাগরে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়া কতরূপে কতভাবে নাচিয়া বেড়ায়, কতভাবে কত লীলা করে, তাহা কখনও কি সংসারে সীমাবদ্ধ মনুষ্যমনের চিন্তার গোচর হইতে পারে? ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বউচ্চ দেবতাহৃদয় পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাহার মধ্যে চৈতন্য অর্থাৎ চিৎশক্তি কতভাবে কতরূপে কত খেলা খেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে যখন দিব্য-চক্ষু খুলিয়া

যাইবে তখন কতকটা বুঝিতে পারিবে যে কৃষ্ণপ্রেম কি পদার্থ !

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণপ্রেম বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জয়, তৎপরে চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা, তৎপরে বাসনানাশ (অবশ্য সাংসারিক বাসনা) প্রভৃতি কতকগুলি সাধন বিশেষ প্রয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপা তো আছেই। কৃষ্ণও ব্রজের সাধকগণকে ও গোপীগণকে কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদন করাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন তাহাও চিন্তনীয়। প্রথমতঃ অলৌকিক জন্ম চাই অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের বিশেষ সুকৃতি ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পরে ছয়টা অসুর বিনাশ অর্থাৎ কি করিয়া ছয়টী রিপু সংযত করিয়া জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় তাহা দেখান হইয়াছে। তাহার পর অঘাসুর নামে একটী অসুর বিনাশ করিয়া সকলকে বুঝাইয়াছেন যে, কিরূপে পাপের সংস্কার পর্য্যন্ত নাশ করিয়া নির্ব্বাসন বা অনাসক্ত হওয়া যায়। তাহার পর কালীয়দমন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, এমন শক্তিমান হইতে হইবে যাহার সান্নিধ্যে সর্পবৎ খলপ্রকৃতি মানুষের ভিতরেও গোপীভাবের গোপীপ্রেমের সঞ্চার হয়। ইহার পর সেই বস্ত্রহরণ,—স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ শরীরে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী নামে যে আবরণ আছে, যাহাতে মানুষকে ভগবৎদর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই আবরণরূপী বস্ত্রগুলি হরণ করিয়া গোপীদের

এমন একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিলেন, যখন তাহাদের চোখ ভগবান ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না; কান সেই ভগবৎশব্দ—সেই অনাহত শব্দব্রহ্মরূপ বেণুরব ছাড়া, সেই অব্যক্ত ওঁকার-ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইল না; নাসিকা সেই অঙ্গের সৌরভ ছাড়া আর কিছুরই গন্ধ অনুভব করিতে পারিল না; জিহ্বা সেই অমৃতরস ছাড়া আর কিছুরই আস্বাদ পাইল না। তাঁহারা তখন যাহা কিছু স্পর্শ করেন অর্থাৎ কেহ গায়ে হাত দিলে বা কাহারও গায়ে হাত দিলে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণঅঙ্গ স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্য বিষয় চিন্তা করিতে মন সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া পড়িল। এই বস্ত্রহরণ দ্বারা গোপীরা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" উপনিষদের এই সারভূত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিলেন।

রাসলীলায় দেখান হইয়াছে প্রত্যেক পরমাণুতে কিরূপে কি ভাবে ভগবৎসত্ত্বা জড়িত। প্রত্যেক পরমাণুতেই ভগবানের প্রকৃতিপুরুষের রাধাকৃষ্ণের সেই আদর্শ লীলাখেলা অনুভব করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেম কি পদার্থ জানিয়া জনম সার্থক করিয়াছেন। রাসের নৃত্য তখন প্রত্যেক পরমাণুর গতিতে প্রতি শিরায় প্রতি রক্ত-বিন্দুতে, গ্রহউপগ্রহাদি প্রত্যেক পদার্থের গতিতে অনুভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গোপীদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির অবস্থা এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আট ভাগে বিভাগ করিয়া

তাহার প্রত্যেক ভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদের সে সব ব্যবস্থাপদ্ধতি দেখিলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এই আট ভাবের বিভাগের সঙ্গে পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গযোগ, ব্যাকরণের অষ্টাধ্যায়তত্ত্ব-বিচারে বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়। তখন তাঁহাদের নিন্দা করা তো দূরের কথা, চির জীবনের তরে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ না হইয়া যে আর থাকা যায় না। ভাই, কৃষ্ণপ্রেমের কথা কি বলিব! আমার সামান্য বুদ্ধিতে ভগবৎকৃপায় যতটুকু অনুভব করিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে এমন আর জগতে নাই; এ বাস্তবিকই দেবের দুর্লভ পদার্থ—বাস্তবিকই এ কৃষ্ণনাম "গোলোকে গোপনে ছিল" "এ নাম কোথা হ'তে কে আনিল" "এ নাম জীব তরাতে এসেছিল"।

তারপর কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করিতে হইলে কয়েকটী বিরুদ্ধ ভাবের একাধারে সম্মিলন বিশেষ চিন্তনীয়। সমুদয় বৃত্তিগুলির একাধারে সম্পূর্ণরূপে স্ফুরণ ভগবানে না হইলে আর কোথায় হইবে? মনে কর, যিনি আপ্তকাম সর্ব্বজ্ঞ নিত্যতৃপ্ত নির্ব্বাসন জগতের মহাপ্রলয়েও যাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই তিনি রাধা রাধা বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যান, কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুস হইয়া পড়েন, রাধা যে রাস্তা দিয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইবেন সেই "তপ্ত বালুতে ছিটায় পানি" হয় তাঁহার কাজ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি রাধার কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায়

অস্থির অধীর পাগল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। যাঁহাকে দেখিয়া ভয় প্রাণের ভয়ে অধীর হইয়া কোথায় পালাইবে ঠিক পায় না (ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং), তিনি মাতার রজ্জু-বন্ধনের ভয়ে অধীর হইয়া পলায়নতৎপর। একটা গাছের পাতা ছিঁড়িলে একটা গাছের ফুল ছিঁড়িতে দেখিলে যাঁহার প্রাণে আঘাত লাগে অসহ্য যাতনা বোধ হয়, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সেনাপতি—কংসাদি অসুরের প্রাণহন্তা। এইরূপ ঘটনা দ্বারা কৃষ্ণজীবন পরিপূর্ণ। আচ্ছা বলতো কার চোখের জলের দাম বেশী—একজন ঘোর কামাতুর ভীরু কাপুরুষের, না একজন জিতেন্দ্রিয় বীর পুরুষের? এই ভাবটী চিন্তা করিয়া বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় চিন্তা করিবে। দয়া ও ন্যায়, অহিংসা ও শাসন, প্রেম ও বীরত্ব আদি যাবতীয় বিরুদ্ধভাবের একাধারে এমন সমন্বয় আর অন্য কোন জীবনে আমার দর্শন হয় নাই। "জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ে"র ভাব, এমন সুন্দরভাবে আর কোথায় দেখিতে পাইবে? যতগুলি সদ্‌বৃত্তি আছে তাহাদের প্রত্যেকের সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি আমি শুধু একমাত্র কৃষ্ণজীবনেই দেখিতে পাইয়াছি। বঙ্কিমবাবুর এই কথাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগে—"অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথম অবস্থায় আদর্শ হইতে পারে না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা অর্থাৎ যাঁহাদের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায় তাঁহারাই

সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এইজন্য যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টিয়ান্‌দের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধদের আদর্শ। কিন্তু এইরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই; কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি সকলেই অনুশীলনের চরম আদর্শ। তাহার উপর রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মল ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তাহা নহেন; ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট। ইঁহাদিগের সর্ব্ব-বৃত্তিই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত, শক্তিমান হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়। যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম-লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই; তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।”

বেদ-উপনিষদে যে রহস্য তত্ত্বাকারে লুক্কায়িত ছিল, তাহাই যেন কৃষ্ণজীবনে ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। যদিও তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভাবের পূর্ণ সামঞ্জস্য

দেখাইতে গিয়া লেখকবিশেষে অনেকটা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনে যে আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্ব অনেকটা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্বে যে রহস্য দেখাইয়াছেন, রামায়ণ রামতত্ত্বে, শিবপুরাণ শিব-তত্ত্বে, বাইবেল যীশুরহস্যে সেই তত্ত্বেরই একটা আভাস-প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। ইহাঁরা যেন এক দেশ হইতেই, একের কাছ হইতেই মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়াছিলেন। সময় সময় মনে হয়, একজনই যেন সেই স্বর্গীয় সমাচার বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করিয়া প্রচার করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। লীলাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সৃষ্টিস্থিতিলয়-তত্ত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক-রহস্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সাধক অন্ততঃ দুইতিন বৎসর যাবৎ ধ্যানযোগে সিদ্ধাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়া পরে পুনরায় দুইতিন বৎসর যাবৎ চিন্তা করিবেন যে, পঞ্চাশ-ষাট হাজার স্ত্রী-পুরুষ এবং যাবতীয় সিদ্ধ-মহাত্মা কোন অপ্রাকৃত আলোর দেশে একত্র সমবেত হইলে তখন তাঁহারা কিভাবে কাজ করেন বাস করেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া কিভাবে আদানপ্রদান-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। ইহার পরে সমাধিযোগে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, এই সমস্ত পূর্ণ-কাম পূর্ণসিদ্ধ আত্মরতি আত্মানন্দ মহাপুরুষদের মাঝখানে শ্রীভগবান তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনন্ত মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-

লাবণ্যের জীবন্ত বিগ্রহরূপে প্রকট হইলে, তখন তাঁহার সঙ্গে ঐ সব সিদ্ধ-মহাত্মাদের কিভাবে আদানপ্রদানকার্য্য চলিতে থাকে। কৃষ্ণলীলা রামলীলা শিবলীলা যীশুলীলা প্রভৃতি সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গে শ্রীভগবানের আদান-প্রদানরহস্য ছাড়া আর কিছুই নহে। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ মহাত্মাদের ভগবান সহ কার্য্যকলাপ ভাববিনিময় প্রেমআস্বাদন-রহস্য লইয়াই যে আমাদের লীলাতত্ত্ব। লীলার সহচরগণ লীলার উপকরণগুলি লীলার স্থানগুলি পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় আনন্দবিগ্রহের সারতত্ত্ব দ্বারা নির্ম্মিত বা পরিকল্পিত। ভগবান দয়া করিয়া যাহাকে দিব্য-চক্ষু প্রদান করেন, শুধু সে-ই কেবল লীলাতত্ত্ব-আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে। আবিঃ! তুমি প্রকাশিত না হইলে তুমি আমাদের সকল তত্ত্ব প্রকাশ না করিলে, তুমি নিজগুণে আমাদিগকে দিব্য-দৃষ্টি দান না করিলে আমরা আর কি করিয়া তোমার লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিব! তুমি সহায় হও—তুমি প্রকাশিত হও; তুমি আপন মহিমা জগতে প্রচার কর, আমরা তোমাকে দেখিয়া তোমার ধ্যান করিয়া ও সেবা করিয়া জীবন সার্থক করি।

কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণপ্রেম বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাধনা দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিতে হইবে, চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিতে হইবে; কারণ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে সংযত না হইলে,

চিত্ত শুদ্ধ শান্ত পৃথিবীর যাবতীয় সংস্কারবর্জ্জিত না হইলে, সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিবার সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত লীলা দেখিবার জন্য অপ্রাকৃত চোখ চাই (সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব), অপ্রাকৃত বাণী শুনিবার জন্য অপ্রাকৃত কান চাই (সকর্ণঃ অকর্ণ ইব), অপ্রাকৃত লীলা আস্বাদ করিবার জন্য অপ্রাকৃত মনবুদ্ধি চাই ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন-বুদ্ধি, প্রাকৃত জগতের সংস্কার লইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব আস্বাদ করিবে, তাহা অসম্ভব। এইজন্যই বোধ হয় কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিবার জন্য সব আপ্তকাম সিদ্ধ-মহাত্মাগণ আসিয়া বৃক্ষরূপে লতাপাতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে অনধিকারী আসিয়া রসস্বরূপের রসলীলায় রসাভাস ঘটায়, তাই শুনিতে পাই জ্ঞানাবতার পাগল ভোলানাথ নিজে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামের কোটালের কাজ করিতে আরম্ভ করেন। রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণ যে কেন দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সকল অভ্যাগতদের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, ভগবান যীশু কেন নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধোয়াইতেন, চৈতন্যদেব যে কেন নিতাইকে পায় ধরিয়া নাম লওয়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অনুভববেদ্য। নিজে সিদ্ধ না হইলে সিদ্ধাবস্থার কার্য্যপ্রণালী লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না ; তাই তো কৃষ্ণলীলার বক্তা ও শ্রোতাকেও সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইবে। পরমার্থ বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতাকে "আশ্চর্য্যো বক্তা

কুশলোঽস্য শ্রোতা' বলিয়া উপনিষদও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার প্রচারক শুকদেব, আস্বাদক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং। যিনি কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে এইভাবে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া সমাহিত হইয়া বসিতে হইবে, তারপরে মনে মনে ধ্যাননেত্রে দর্শন করিতে হইবে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম; কারণ অমন স্থান না হইলে অন্যত্র কি আনন্দময়ের আনন্দলীলা অভিনীত হইতে পারে? তারপরে চিন্তা করিতে হইবে বাসন্তী পূর্ণিমার রজনী; যাহার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া রসিকশেখর নিজে লীলাচ্ছলে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে প্রলোভিত হন। তারপরে সেখানে মনে করিতে হইবে অসংখ্য আপ্তকাম সিদ্ধ-মহাত্মাদের আগমন, যাঁহারা শুধু ভগবৎবিভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যোগমায়াপ্রভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি ছাড়া ঐ সব মহাত্মাদের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। ইঁহাদের কাহারও ভিতরে কোনও কামনা-বাসনা, আসক্তি-হিংসা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদিভাবের বীজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান নাই; ইহাঁদের প্রত্যেকেরই চিত্ত স্বচ্ছ, ইহাঁদের মধ্যে ভিতর-বাহির বলিয়া দুইটি পৃথক তত্ত্ব নাই। সকলেই আত্মপর-ভাববর্জ্জিত, একে অন্যের ভিতর নিজের স্বরূপদর্শনে অভ্যস্ত। প্রত্যেকে অন্যের সুখকে নিজের সুখ বলিয়া মনে করেন, ইহাঁদের সকলেই কৃষ্ণসুখ

লইয়া ব্যস্ত—“কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য”। চিত্তে জগতের সংস্কার নাই, সুতরাং লজ্জা ও ঘৃণা ইহাঁদের নিকটেও আসিতে পারে না। সকলেই কুল-শীল-মানে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। “কৃষ্ণপ্রেম দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈল চুর” সুতরাং নিজে কে কোথায় আছেন তাহা পর্য্যন্ত যেন মনে করিতে পারেন না। তখন ইহাঁদের মাঝখানে যদি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক নিখিলসৌন্দর্য্যসারভূত মদনমোহন মন্মথ-মন্মথবেশে চারিদিকে রসের মাধুরী আনন্দের লহরী ছড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেই আগন্তুক ও সেখানকার উপস্থিত সিদ্ধ-মহাত্মাদের ভিতরে যে ভাব ও ক্রিয়া আরম্ভ ও অভিনীত হয়, তাহাই কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণপ্রেম। শাস্ত্রকার সে অবস্থাকে ‘অবাঙ্‌মনসোগোচর’ বলিয়া স্ব-সংবেদ্য মূকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয়ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবিগণ সমাধিযোগে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছেন “হে সখি, কৃষ্ণপ্রেমের আমি কিছুই জানিনা কিছুই বুঝিনা, যাহা জানি তাহাও প্রকাশ করিবার মতন ভাষা আমার নাই। তিনি আসিয়া যেই আমার হাতখানা ধরিলেন অমনি ‘হাম অগেয়ান’।” ......তার পরের কথা কে দেখিবে, কে মনে রাখিবে, কে বলিবে! বৈষ্ণব সাধকগণ রসোৎদ্গারলীলার ভিতর দিয়া এতত্ত্ব আস্বাদ করিতে চেষ্টা করেন। জীবাত্মা সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যে

অপার্থিব আনন্দরস উপভোগ করেন, ধ্যানের অবস্থায় সেই আনন্দ উপলব্ধির কতকটা চেষ্টা করাই রসোদ্গার। সখীরা শ্রীরাধার মন-স্থানীয়া কায়-ব্যূহবিশেষ। অবাঙ্‌মনসো-গোচর তত্ত্ব আস্বাদনের সময় স্বকীয়া মনোবৃত্তি সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারে না। বাসনাক্ষয় মনোলয় না হইলে যে পরম তত্ত্ব প্রকাশ পায় না "জ্ঞানং কুতঃ সম্ভবতীহ তাবৎ প্রাণোঽপি জীবতি মনো ন ম্রিয়তেঽপি যাবৎ"। রাসলীলায় রসিকশেখর শুধু তাঁহার স্বরূপশক্তির ভিতরেও হ্লাদিনীর সার মহাভাবঠাকুরাণী জীবাত্মারূপিণী হ্লাদিনীশক্তিকে নিয়া রসাস্বাদ করেন। অন্যের আমিত্ব-বোধের পর্য্যন্ত সেখানে প্রবেশনিষেধ। বাহিরের লোকে আর কি করিয়া এ তত্ত্ব অনুভব করিবে? রাধারাণী দয়া করিয়া সখীদের একটু বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাই ভক্তেরা সিদ্ধ-মহাত্মারা সেই সখীদের অনুগত হইয়া সে রস আস্বাদ করেন।

কোনও জায়গায় যদি অসংখ্য পবিত্রীকৃত লৌহখণ্ড বর্ত্তমান থাকে আর ঠিক তার মাঝখানে যদি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চুম্বক পাথর আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই লৌহখণ্ড ও চুম্বক পাথরের মধ্যে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কতকটা কৃষ্ণপ্রেমের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। কিংবা কোথাও যদি অনেকগুলি পতঙ্গ উপস্থিত থাকে, আর তার মাঝখানে যদি হঠাৎ একটী সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় আলোকপিণ্ড আসিয়া উপস্থিত হয়; তবে তখন সেই আলোকপিণ্ডের সহিত

পতঙ্গসমূহের যে লীলা অভিনীত হয়, তাহাও তোমাদের কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধির কতকটা সহায় হইতে পারিবে। সাধারণ দৃষ্টিতে অনেকে কৃষ্ণপ্রেমে দোষারোপ করেন ; তাহা করিবারই কথা। অপ্রাকৃত অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম প্রাকৃত জীব আর কি করিয়া ধারণা করিবে ? আর যে যাহা বুঝিতে পারে না, হয় তাহার প্রশংসা করিবে, না হয় নিন্দা করিবে, আর অতি অল্পসংখ্যক লোকই সেখানে চুপ করিয়া থাকিবে। শুকদেবের বিশ্বাস, "যোগেশ্বরেশ্বর" "আত্মারাম" "মন্মথমন্মথ" "তেজীয়সাং ন দোষায়" ইত্যাদি কথা দ্বারা তিনি কৃষ্ণপ্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাসলীলা শ্রবণ দ্বারা মানুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে সমর্থ হয়, ইন্দ্রিয়ের রাজত্ব ছাড়িয়া অপার্থিব অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম আস্বাদ করিতে সক্ষম হয়, ইহাই ছিল শুকদেবের বিশ্বাস। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের উপর আর কাহারও দোষারোপ করিবার সুযোগ রাখিয়া যান নাই। বাস্তবিকই যিনি মন্মথমন্মথ, যাঁহাকে দূর হইতে দেখিলে যাঁহার কথা শুনিলে যাঁহাকে স্পর্শ করিলে মানুষ তাহার আমিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, তাঁহার চরিত্রে দোষদর্শন করিতে-যাওয়া যে নিতান্তই কলুষিতচিত্ত ব্যক্তির লক্ষণ।...

আমি কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে কখনও দোষদর্শনের কল্পনাও করিতে পারি নাই। দোষ নাই—দোষ থাকিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য ; কারণ আমি তাঁহাকে অপাপবিদ্ধভাবে গ্রহণ

করিয়াছি। তারপরে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীকে অপ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় প্রাকৃত জগতের অভিধানের পবিত্রাপবিত্র শব্দ দিয়া সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ববিচারে আমি কখনই প্রয়াস পাই না। তারপর আমার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না—দোষ দিব কার? চুম্বকের না পবিত্র লোহার? 'পবিত্র' এইজন্য বলি, সতী ছাড়া অন্যে কৃষ্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হইত না "সতী ছাড়ে নিজ পতি"। আগুনের দোষ দিব কি পতঙ্গের দোষ দিব, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি কিন্তু দোষ দিতে প্রস্তুত—যদি দোষ দেওয়ার কিছু থাকে, তবে সেই চুম্বক ও লোহার সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে যিনি এমন একটা সম্বন্ধ সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার। অবশ্য আমার এই মত শুনিয়া জগৎস্রষ্টা নিশ্চয়ই তাঁহার মত বদলাইতে প্রস্তুত হইবেন না—আমার অবস্থা আস্পর্দ্ধা দেখিয়া হয়ত একটু হাসিতে পারেন, এই মাত্র! ......আমার কৃষ্ণতত্ত্ব উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ববিশেষ। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ বৃন্দাবনের আদর্শ কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্য দিয়া সে তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণব কৃষ্ণজীবনের কতকগুলি কাজ বিষ্ণুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে সীমাবদ্ধ করিয়া শুধু প্রেমময়রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

গণেশপূজা*

গণেশ হিন্দুদের পঞ্চদেবতার—পঞ্চতত্ত্বাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের একজন। ইহার অধিষ্ঠান মূলাধারস্থ ক্ষিতিতত্ত্ব, যেখানে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুপ্তভাবে অবস্থিতা। সেই সুষুপ্তা (latent) শক্তিকে জাগ্রত (patent) করাই সমস্ত সাধনভজনের প্রধান উদ্দেশ্য। গণেশপূজার বিধানে আমরা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিবার ব্যবস্থাটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। ভগবান আমাদের ভিতরে তাঁহার সমস্ত শক্তি মাধুর্য্য ও আনন্দ নিয়া বীজাকারে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, সেই লুকান চোরকে খুঁজিয়া বাহির করা, সেই বীজটিকে বৃক্ষরূপে পূর্ণভাবে পরিণত করাই সমস্ত সাধনভজনের উদ্দেশ্য। সাধন আরম্ভ হয় মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্বে আর সেই তত্ত্বের অধিষ্ঠিত চৈতন্য গণেশ, তাই তাঁহার পূজা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। মনে রাখিতে হইবে পঞ্চদেবতার প্রত্যেকে যেমন একএকটি তত্ত্বের মালিক,

* পারমার্থিক গণেশতত্ত্বটি ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে কোনও সময়ে সমাজদেহের ভিতর দিয়া ফুটিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে এই চিঠি লিখিত। ইহাদ্বারা ইহার আধ্যাত্মিক ও সাধনতত্ত্বকে অস্বীকার করা হয় নাই বরং সংক্ষেপে সমর্থন করা হইয়াছে।

তেমনি প্রতি তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে —প্রত্যেকেই পূর্ণ (complete in itself)। গণেশ-তত্ত্ব নিত্য পদার্থ। তাঁহার সাধনপ্রণালী আদর্শ সাধকের নিকট জানিয়া লইতে হয়; যুগে যুগে সেই গণেশতত্ত্ব অবতার গ্রহণ করেন। যাঁহারা সব 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া সমস্ত সাধনভজনকে অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহাদের জানা উচিত যে পুরাণোক্ত গণেশতত্ত্ব সেই আধ্যাত্মিক গণেশতত্ত্বের একটি অবতারবিশেষ। আদর্শ জননেতাগণ অল্পাধিকভাবে গণেশের উদ্দেশ্য সফল করিতে —গণেশের মহিমা প্রচার করিতেই নিরত। দক্ষিণ দেশে মহাত্মা শিবাজী গণপতির মহিমা বিশেষভাবে প্রচার করেন।

গণেশ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে দুর্গাতত্ত্ব দুর্গাপূজা-রহস্য একটু জানা দরকার। জীবের সমস্ত দুর্গতিহারিণী মোক্ষদায়িনী মা দুর্গা কি ভাবে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভগবৎমহিমা ভগবৎশক্তির লীলারহস্য জগতে প্রচার করেন, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। যাহা সাধকগণ সমাধিযোগে প্রত্যক্ষীভূত করেন, তাহার কতটা মন কল্পনা করিতে পারে— ভাষা বর্ণনা করিতে পারে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। ভগবৎতত্ত্ব বাক্যমনের অগোচর "আবাঙ্‌মনসোগোচরং"; মন তাহাকে ধ্যান করিতে গিয়া বাক্য তাহাকে প্রচার করিতে গিয়া হার মানিয়া ফিরিয়া আইসে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইত্যাদি শ্রুতিবচনগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

জ্ঞানের কাজই যখন অপ্রকাশকে আস্তে আস্তে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা, অজানাকে আস্তে আস্তে জানার ভিতরে নিয়া আসা, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া,—তখন আমাদের মা আদ্যাশক্তিকে বর্ণনা করিতে যাওয়া একান্ত ধৃষ্টতা নহে। আজ যে তোমাকে জানিনা সেই তুমি উপাসনার দ্বারা সান্নিধ্য হেতু সংসর্গ প্রভাবে কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে আমার নিকট প্রকট হইতে আরম্ভ করিবে। চিৎশক্তির কাজই আপনাকে প্রকাশ করা, তেজের কাজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়া, সচ্চিদানন্দের কাজ তাঁহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে ফুটাইয়া বাহির করা। মা নিজে প্রকট হইতে যখন ব্যস্ত, তখন আমাদের মাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। অন্ততঃ এ চেষ্টা সাধনা-বিশেষ। ভগবৎধ্যান ভগবৎচিন্তন ভগবৎকীর্ত্তন চিত্তের যাবতীয় ময়লা দূর করিয়া ভগবৎবিকাশের ভগবৎদর্শনের সহায় হয়। সাধারণ চেষ্টার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া উত্তেজিত হইয়া বিশেষ চেষ্টার প্রভাবে প্রকৃত তত্ত্বাবিষ্কার বিশেষ অসম্ভব নহে।

যে প্রকৃতিকে সাংখ্যাদি দর্শন-শাস্ত্র অচেতন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই প্রকৃতিকে ভক্ত সাধক চৈতন্যময় মাতৃ-রূপে প্রত্যক্ষীভূত করেন। সাধক জানেন পুরুষ ছাড়া প্রকৃতি অচিন্তনীয়; জগৎ এবং জগতের প্রত্যেক মানুষই যে সেই

প্রকৃতিপুরুষের আদি-যুগলের লীলাবিভূতি। পুরুষ হইতে প্রকৃতিকে বা প্রকৃতি হইতে পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা ভক্ত কখন কল্পনায়ও আনিতে বৃথা প্রয়াস পায় না। তাই ভক্তের প্রকৃতি মা আদ্যাশক্তি চৈতন্যময়ী। আনন্দরূপিণী আনন্দময়ী মা যে চিরদিন সন্তানের কল্যাণসাধনে তৎপর, বাৎসল্যভাবের পূর্ণপ্রকটিত বিগ্রহ। মা জগদাকারে প্রকটিতা আপন মঙ্গলময় বিধানে জগৎশাসনে জীবের কল্যাণসাধনে তৎপরা।

ভগবৎবিধান প্রকৃতির বিধান। মায়ের আদেশপালনে পদে পদে সুখ-শান্তি-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি বিভূতির বিকাশ—পরিণামে মুক্তিলাভ, শিবত্বপ্রাপ্তি। মায়ের আদেশলঙ্ঘনে পদে পদে বিপদ অসুবিধা দুঃখলাঞ্ছনা, পরিণামে বিনাশ—এই সব তত্ত্ব সাধকগণ দুর্গামূর্ত্তির ভিতর দিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। মা যেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"হে আমার প্রিয় সন্তানগণ! আমাকে ডাক আমার পূজা কর আমার বিধান মতে চল, তোমাদের সকল অভাব সমস্ত দুঃখকষ্ট আমি দূর করিয়া দিব। আমি যার বাড়ী যাইব, আমার সঙ্গীগণও আমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। জ্ঞানের আধার হংসবাহন ব্রহ্মবিদ্যা—আমার ব্রাহ্মণী-শক্তি সরস্বতী তোমার সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিয়া তোমার মুক্তিলাভের সহায় হইবে। সমস্ত বলাধার তেজাধার অনন্তশক্তির বিকাশ ময়ূরবাহন সৌন্দর্য্যপ্রিয়

বিদ্যুৎচালক দেবসেনাপতি কার্ত্তিক ক্ষত্রিয়শক্তির জীয়ন্ত বিগ্রহ, তোমার ধর্ম্মযুদ্ধের সহায় হইয়া যাবতীয় অশুভ বিনাশ করিয়া দিবে। অনন্তঐশ্বর্য্যরূপিণী পদ্মালয়া বৈশ্যশক্তি লক্ষ্মী কৃষি-বাণিজ্য আদির ভিতর দিয়া তোমার যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিয়া দিবে। গণনায়ক সিদ্ধিদাতা শূদ্রশক্তি তোমার উন্নতিবিধানে তোমার সেবাকার্য্যসাধনে সহায় হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সর্ব্বদা তোমাকে অভয়দান করিতে থাকিবে। এই চারি শক্তির সামঞ্জস্য-যুক্ত পূর্ণ পরিণতিতে তোমার আত্মরাজ্য পূর্ণতালাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির শিবত্বলাভের ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে সহায় হইবে। সাধন আরম্ভ হয় শূদ্রভাব হইতে—পরিণতি ব্রাহ্মণভাবে; সেজন্য গণেশের পূজা সাধনারম্ভে। স্মরণ কর "স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি" মায়ের অমোঘ-বাণী।

অপর দিকে মার আদেশ প্রকৃতির বিধান অবমাননা করিলে তোমার কি দুরবস্থা হইবে, তাহা অসুর-সিংহের অবস্থা হইতে জানিয়া লও। সুরবিরোধী ভগবৎ-আজ্ঞালঙ্ঘনকারী অসুর মায়ের পদানত—মায়ের উভয় পদ তাহার অত্যাচারের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে (Thus far you shall go and no farther)। ইহাতেও যখন অসুরের হুঁস হইল না তখন মায়ের ত্রিশূল—ত্রিগুণজনিত ত্রিতাপ অসুরের বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। পরিণামে কালরূপী সর্প তাহার বিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া

অসুরকে সুর করিতে অসুরের কল্যাণসাধন করিতে ব্যস্ত। অসুরগণ কিরূপে মৃত্যুর ভিতর দিয়াও অমৃতত্বের অধিকার লাভ করে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে পুরুষ মার পদতলে অবস্থান করিয়াছিল—বিজ্ঞানের তামসিক প্রচারে যে ভগবান অস্বীকৃত হইতে বসিয়াছিলেন, সেই পুরুষ আজ মার পূর্ণ পরিণতিতে মার মস্তকে শোভিত হইয়া ভগবৎমহিমা মুক্তকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতে বসিয়াছে।

মার আরাধনায় শক্তির সাধনায় জাতির অধঃপতন অসম্ভব। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, ভারত আজ মার সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে; অজ্ঞানতার প্রভাবে কুসংস্কারের বশে স্বার্থের মোহে ভগবানের আসনে শয়তানকে বসাইয়া বিদ্যার স্থানে অবিদ্যার পূজা করিয়া উন্নত আর্য্যধর্ম্মকে অবনতির চরম সীমায় লইয়া যাইতে বসিয়াছে। ইহারই তো স্বাভাবিক ফল, পরাধীনতায় রোগে শোকে তাপে দুঃখদৈন্যে মা-লক্ষ্মীর বংশধরগণ দারিদ্র্যের শেষ সীমায় আনীত, দেব-সেনাপতির সেবকগণ কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত, ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায্য উত্তরাধিকারীরা অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া জগতে প্রচারিত; বাস্তবিকই যে "শক্তিপূজা কথার কথা নয়— যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না"। আজ 'অজপা'-সাধনপ্রণালী 'হংস'-মন্ত্র সামান্য হংসে পরিণত হইয়া মা সরস্বতীকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তি সুন্দর ময়ূরে পরিণত

হইয়া দেবসেনাপতিকে কি রকম বিলাসী অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিছুই তুচ্ছ নহে, সামান্য জিনিস সযত্নে রক্ষিত হইয়া সময়বিশেষে কল্যাণের সহায় হয়, সমস্তের সদ্‌ব্যবহারে জাতির উন্নতি—এই উন্নতিসূচক ভাবগুলি মা-লক্ষ্মীর বাহন আদি অন্ধকারপ্রিয় গুহাবাসী পেচকে পরিণত হইয়া মা-লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত জনসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের অভাবে দেশকে অলক্ষ্মীর বাসস্থান করিয়া তুলিয়াছে। শাক্তের যত শক্তি যত বীরত্ব, তাহা আজ শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইয়া জাতিকে একেবারে শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দে বিভোর মঙ্গলময় চতুর্থ তত্ত্ব জ্ঞানাধার শিবকে পর্য্যন্ত পার্থিব নেশায় বিভোর করিয়া তমোগুণের নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিয়াছে। গুণাতীত অবস্থা যে সত্ত্বগুণেরও উপরে, উদাসীন ভাব যে উৎ—ঊর্দ্ধে গুণাতীত প্রদেশে সত্ত্বগুণেরও অনেক উপরে, তাহা ভুলিয়া গিয়া পরমহংসাবস্থাকে পাষাণে কদাচারে পরিণত করিয়া ধর্ম্মের নামে যাবতীয় অধর্ম্ম স্বৈরগতিতে অনুষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে।

দুর্গাপূজা—শক্তির আরাধনা দ্বারা শক্তি লাভ করিয়া শক্তিমান হইয়া শক্ত পদার্থে পরমব্রহ্মে তন্ময় হইয়া ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অবাধিত প্রকাশের সহায় হওয়া। তাঁহাতে প্রীতি রাখিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য-

সাধনের সহায় হওয়াই যে তাঁহার আরাধনা "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

গণেশ গণের, দেবতাবৃন্দের, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শাসনকর্ত্তা। সব তত্ত্বগুলিকে ভগবৎঅভিমুখী করিয়া পরম সিদ্ধিলাভের অনুকূল করিয়া তোলাই গণেশের গণপতির প্রধান কার্য্য; তাই গণেশ সিদ্ধিদাতা। গণেশ শিব-পার্ব্বতীর পুরুষপ্রকৃতির জ্যেষ্ঠ পুত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বা বিভূতি। ইনি রূপে ও গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন (highest manifestation of the positive force)। ইহাঁর প্রধান শত্রু শনি (negative force)। দেবাসুরের, বুদ্ধ ও মারের, যীশু ও সয়তানের সংগ্রাম যাবতীয় দ্বন্দ্বভাবের বিগ্রহ সর্ব্ববাদী সম্মত। শনির প্রকোপে গণেশের মস্তকচ্ছেদন, জ্ঞানের আবরণের কতকটা রূপান্তরপ্রাপ্তি অস্বাভাবিক নহে। এইজন্য গণেশ পরম সুন্দররূপে সৃষ্ট হইয়াও শনির কোপে পর পর পরিণতিতে কতকটা বিকৃতভাবাপন্ন। দেবতারা তাঁহাদের পরম শত্রু শনির ভয়ে অস্থির—স্বর্গ হইতে নিরাকৃত, ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক চিরদিন রক্ষিত। পুরাণোক্ত দেবতাগণের দেবাসুর-সংগ্রামসময়ে ব্রহ্মতেজের লোপ, বুদ্ধির বিকৃতি, শনি কর্ত্তৃক হৃতমস্তক বিষ্ণুরক্ষিত গণেশের গজেন্দ্র-বদনরূপ বিশেষণের সার্থকতা সম্পাদন করে। রঙ্গমঞ্চে রাম-রাবণের মধ্যে কে বড় কাহার আবশ্যকতা বেশী, তাহা

বলা কঠিন হইলেও রামের মত হইতেই চেষ্টা করা উচিত। "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ" এই উপদেশ গণাধিপের সর্ব্বপ্রথমে পূজার অধিকারের কথা মনে করাইয়া দেয়। অসুরদের সঙ্গে সংঘর্ষণে দেবতাদের বিকৃতি সুন্দর গণেশটিকে যেন অনেকটা তমোভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্মের প্রথম প্রতিবিম্ব কতকটা ব্রহ্মসদৃশ 'আনন্দরূপমমৃতম্'এর অনুকূল, পরবর্ত্তী বিকাশগুলিকে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আর তত সুন্দর মনে হয় না।

সিদ্ধ-মহাত্মাগণ উচ্চাঙ্গের সাধকগণ পূর্ণ পরিণত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিষ্ণুর রূপগুণবিভূতি লইয়া বিভোর থাকিলেও গণের—সাধারণ লোকদের (mass) পক্ষে গণেশের সেই দেবাসুর-সংগ্রামের ফলে কতকটা বিপরিণত ও আপন আপন অধিকারের অনুকূল গণাধিপের পূজা একান্ত আবশ্যক। আমরা আধ্যাত্মিক গণেশতত্ত্বের একটা আধিভৌতিক বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পুরাণের মধ্যেও দেখিতে পাই।

দক্ষযজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-শক্তির সহিত বৈশ্য ও শূদ্র-শক্তির একটা বিরোধের ভাব, যজ্ঞে বিকৃত হিংসামূলক অনুষ্ঠানের প্রভাব দৃষ্ট হয়। দীনবন্ধু দেবাদিদেব চিরদিন ভূত-প্রেতগণের গুহাবাসী নীচ জাতির সহায়। শিব-বিরহিত যজ্ঞে দক্ষের কুশলের পশুত্বপ্রাপ্তি ঘটিলেও এই বিবাদের বীজ এখানেই নষ্ট হয় নাই। পার্ব্বতীর

সাধনা ও পরিণয়ের ফলে দেবকার্য্যসাধনের জন্য গণেশের উৎপত্তি। গণেশ পরম জ্ঞানী পরম সুন্দর, শিব কর্ত্তৃক গণের জনসাধারণের নায়করূপে নিযুক্ত। পার্ব্বতী অন্নপূর্ণা-রূপে দীনজনে অন্নবিতরণে তৎপরা। বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পক্ষে গণেশকে বিকৃতভাবে বর্ণনা করা গজানন বিকৃতমস্তিষ্ক আদি বিশেষণে বিভূষিত করাও অসম্ভব কথা নয়। (বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীকে কতক পরিমাণে গণেশের অবতার বলা চলে। সভ্যজাতি তাঁহাকে কিভাবে দেখেন ও বর্ণনা করেন তাহা চিন্তনীয়।) বর্ত্তমান যুগের দিকে চাহিয়া বলিতে গেলে গণেশ গণের সর্ব্বসাধারণের পতি নায়ক (leader of the mass)। গণ-গণ তাঁহারই আদেশে চলে—ইচ্ছাপূরণে ব্যস্ত থাকে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী এতত্ত্ব বুঝিতে সাহায্য করিবে। ভারতের সাধারণ লোক যে এখন অনেকটা শূদ্রভাবাপন্ন তাহা বুঝিতে হইবে। গণগণ অসংযত হইলে কি মহান অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইহাদেরে শিক্ষিত ও সংযত কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত না করিয়া স্বাধীনতার মন্ত্র শুনাইতে গেলে ইহারা যে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর ; তবেই গণপতির দায়িত্ব গণপতির প্রাধান্য গণপতির সর্ব্বপ্রথমে পূজার আবশ্যকতা সহজেই বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

পাশ্চাত্য গণনায়কের (leader of the mass) স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী চিন্তা করিয়া দেখিলে আপনা হইতে

গণেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বটি তোমার ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে গণেশের পরিচয়টা ভেবে দেখ, ইনি শিবের সন্তান; ঠিকভাবে চালিত হইলে জগতের কল্যাণবিস্তারের মঙ্গলসাধনের প্রধান অবলম্বন (helpful to the common good if properly guided)। ইনি মা আদ্যাশক্তির দেবী ভগবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র—শক্তিবিকাশের জাতীয় উন্নতিবিধানের সর্ব্বপ্রধান সহায়—সংখ্যায় ও শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি কার্ত্তিকের ভ্রাতা সহচর-সহকারী—সুখদুঃখের চিরসঙ্গী। ইঁহার সাহায্য না পাইলে কার্ত্তিকের ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করাও যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইনি মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতীর সঙ্গে অবস্থিত হইয়া জ্ঞান-শক্তি ও শিল্পবাণিজ্যশক্তির উন্নতিবিধানে তৎপর না থাকিলে দেশের প্রভূত অকল্যাণের সম্ভাবনা। ইনি মা আদ্যাশক্তির দ্বারা সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত, মার সন্তান-সন্ততির কল্যাণসাধনে অভয়প্রদানে নিযুক্ত। গণেশ অভয় না দিলে তাঁহার গণ-গুলি বিদ্রোহী হইলে দেশের সর্ব্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী। জনতন্ত্র জ্ঞানতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাস্তবিকই পৃথিবীর মহান অনিষ্টের কারণ হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যগণ যদি একবার মা দুর্গার দিকে চাহিয়া গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগের কার্য্যবিভাগের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ইহাদের পরস্পর সামঞ্জস্যরক্ষণে পূর্ণ উন্নতিসাধনে যত্ন করিতেন, তবে জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনে ভগবৎ-

ইচ্ছাপূরণে নিশ্চয়ই সহায় হইতে পারিতেন। এই গেল পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক ভাবের নমুনা।

হিন্দুদের সব ধ্যানের মূর্ত্তির লক্ষ্য প্রণব-মন্ত্র। গণেশ-মূর্ত্তিটিকে অনেক সাধক প্রণব-মন্ত্রের বিগ্রহ মনে করিয়া থাকেন। ....

গণপতির ধ্যান ও গণপতির পূজাতত্ত্বের ভিতর দিয়াও গণেশ-রহস্য অনেকটা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গণেশের ধ্যানটি গণেশতত্ত্বটি বুঝিতে হইলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে আধিভৌতিক ঐতিহাসিক তত্ত্বটা মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করা দরকার। তত্ত্বগুলি জীবনের মধ্য দিয়া জাতির মধ্য দিয়া ইতিহাসের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। মূল তত্ত্বগুলি লইয়া যেমন উপনিষদাদি ব্যস্ত, তাহাদের ঐতিহাসিক বিকাশ লইয়াও তেমনি পুরাণ-শাস্ত্রগুলি ব্যস্ত। তত্ত্বগুলি অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার বিকাশ তাহার প্রচার ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন গণেশের ধ্যানের মধ্যে এই উভয় ভাবের সমন্বয় লইয়া যথাসম্ভব একটু বিচার করা যাউক ঃ—

গণেশ "খর্ব্বং"—অনন্ত অসীম তত্ত্ব যেন ধারণার সুগমার্থ সান্ত সীমাবদ্ধরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বসিয়াছেন। সসীমের মধ্য দিয়া অসীমকে ধরিয়া অসীমত্ব অনুভবের অসীমত্বলাভের চেষ্টাই যে গণেশের পূজা। ঐতিহাসিক পৌরাণিক তত্ত্বের মধ্যে দেখান হইয়াছে গণেশ বৈশ্য ও শূদ্রশক্তির

নেতা। বৈশ্য ও শূদ্রশক্তি অপরিণত, সুতরাং তাহাদের নায়ককে খর্ব্ব হ্রস্ব কতকটা বামনের মত বর্ণনা করাই বিধেয়।

"স্থূলতনুং"—সিদ্ধমহাত্মাগণ ভগবানের সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া বিভোর সমাধিমগ্ন থাকিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ সাধকগণকে যে স্থূলতত্ত্ব অবলম্বনে সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে বলা একান্ত আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্মের বিকাশ—স্থূলতনু মূর্ত্তিতত্ত্ব সূক্ষ্ম অমূর্ত্ত-তত্ত্বকে প্রকাশ করে। গণগণের জনসাধারণের অপরিণতি হেতু স্থূলদেহে স্থূলভাবেই বেশী দৃষ্টি। আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদর্শন তাহাদের নিকট ততটা সুলভ নহে বলিয়া তাহাদের নায়ককে স্থূলতনু বলাই সুসঙ্গত।

"গজেন্দ্রবদনং"—অসুরের পরাক্রমে দেবগণ স্বর্গ হইতে নিরাকৃত। দেবস্তবের ফলে শিবপার্ব্বতী হইতে গণেশতত্ত্ব পরম সুন্দর গণপতি আবির্ভূত হইলেন। অন্তর্মুখ হেতু অমন সুন্দর গণেশতত্ত্ব সৃষ্টিকার্য্যে অসমর্থ—ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় সমাধিমগ্ন। বিপরীত স্রোতের দ্বারা তাহাকে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য শনি দেবীকর্ত্তৃক গণেশের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরুদ্ধ। শনির দর্শনে, বিপরীত ভাবের সংঘর্ষণে, ক্রিয়া আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণ পরিণতি—গণেশের সেই সুন্দর মুখখানি আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিষ্ণু তখন গজাসুরের, রাজসিক পরি-

নতির, মস্তক (ভাব) তাহাতে আরোপিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনের, ধারণার, উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। * সিদ্ধ-মহাত্মাগণ যে ভগবানের অতুল সৌন্দর্য্য-

---

* মস্তিষ্ক জ্ঞানের আধার। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভাবে তামসিক ও রাজসিক ভাব দ্বারা চালিত গণসমূহকে কি ভাবে নায়কগণ নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে অনেক সময়ে দাবাইয়া রাখিয়া সাধারণ জ্ঞানের সাধারণ প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। অনেক সময় গণনায়ক উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলেও অনেকে নায়কত্ব তাহার উপর আরোপ করিয়া থাকেন। তখন অনধিকারী নায়ক সেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি বিচারবুদ্ধি পরিচালনার শক্তিসমূহ আপনাতে আরোপ করিয়া নিজের শোভাবৃদ্ধি করিতে বিশেষ প্রয়াস পান; একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে মনুষ্যদেহে হস্তিমুণ্ড কিরূপ শোভাবর্দ্ধন করে। Power and greatness is thrust upon the leader। পাশ্চাত্য জননায়কদের জ্ঞানবুদ্ধি বিচারশক্তি চিন্তনীয়। পুরাণ-বিশেষে শনি গণেশের মাথাটি কাটিয়া ফেলেন, তখন দেবী সেই কবন্ধ-দেহে একটি হাতীর মস্তক লাগাইয়া দেন। সাময়িক পতিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শক্তি দ্বারা গণ পরাভূত ও নিন্দিত হইলে বিষ্ণু তাহার রক্ষাসাধন করেন।

হাতীর গ্রহণশক্তি শাসনশক্তি প্রবল হইলেও বিচার-

মাধুর্য্যে বিমোহিত সাধারণ সাধকগণ সেই ভগবানে কত কি বিরুদ্ধ ভাবের আরোপ করিয়া তাহাকে যেন কতকটা বিকৃত করিয়া তোলেন। শুকদেবের বর্ণিত চৈতন্যদেবের ধ্যেয় কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণ লোকের চোখে কি ভাবে বর্ণিত ও

শক্তি দর্শনশক্তি যে কতটা সীমাবদ্ধ, তাহা তাহার শক্তিমান লম্বা শুঁড়টি ও অতি ক্ষুদ্র চোখ-দুটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কানদুটা কিন্তু ছোট নয়, তবে তাহার উপরের আবরণ পাখার ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। অশিক্ষিত জনগণ তাহাদের মন্তব্যগুলি যেরূপ অসংযত-ভাবে নায়কের সম্মুখে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে, সেগুলি হইতে মন্দগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া ভালগুলি গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত না হইলে জননায়কের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। কুলোর কাজের সঙ্গে হাতীর কানের কার্য্যাবলীর সাদৃশ্য সহজে বোধগম্য। অনেক স্থলে গণনায়কগণের ভাবের ও কাজের মধ্য দিয়া বেশী পরিমাণে তমোভাবই প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়াছে! জননায়ককে জনসাধারণের মন যোগাইতে গিয়া সময় সময় সাধারণের মত অনুসারে আপন মত কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। সেজন্য তাহাকে দেখিলে তাহার মস্তকের কথা ভাবিলে তাহাকে তামসিক অবিবেচক স্থূলদর্শী হস্তিমুণ্ডধারী বলিয়া মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

অনুভূত তাহা চিন্তনীয়। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিটি ইহার সাক্ষী, অসাধক কবিদের বর্ণনা ইহার পোষক, অল্পদর্শী বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণের সন্দেহবাদ ইহার স্মারক। দেবত্বে কতকটা মনুষ্যত্ব আরোপিত হইয়া তাহাকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ও উপাস্য করিয়া তোলা হইল। বিশেষণ সর্ব্বদাই বিশেষ্যকে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ, এমন কি কলঙ্কিত করিয়া তোলে—To put any adjective whatever before the word God is but to limit Him. পুরাণোক্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা গজেন্দ্রবদন-তত্ত্বের মধ্য দিয়া গণনায়কের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় গুণের আভাস পাইয়া থাকি।

"লম্বোদরং সুন্দরং"—গণপতির কাহাকেও বাদ দিলে চলে না। চণ্ডীর বর্ণনায় মা আমার সমস্ত দেবতাদের যাবতীয় শক্তি গ্রহণ করিয়া যাবতীয় শক্তিগুলিকে আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের সমষ্টিভূত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ বর্ত্তমান নাই "দ্বিতীয়া কা মমাপরা"। গণেশকেও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর ন্যায় লম্বোদর হইতে হয়, তিনি সকলকে আপন আপন অধিকার অনুসারে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করেন। সমষ্টিভূত মূর্ত্তিটি কিন্তু কোন ভাবেই আপন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সমষ্টিভূত চৈতন্যকে দর্শন-শাস্ত্রও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক

তত্ত্বেও গণনায়ক অনেকের পেটের কথা ভাবিতে পারিলেই প্রশংসা লাভ করেন।

"প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্"—

এই বিশেষণটি গজেন্দ্রবদনের কার্য্যকলাপ কতকটা প্রকাশ করিতেছে। হাতীর মদস্রাব একটা মত্ত ভাবের দ্যোতক—ইহার মধ্যে আকর্ষণ-গুণের প্রভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। গণপতিকে এখানে কতকটা রসিকশেখর সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। গণপতিকে যে কিভাবে মদগর্ব্বিত সুমিষ্ট বাক্যজাল দ্বারা সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট উৎসাহিত ও চালিত করিতে হয়, তাহা এখানে চিন্তনীয়!

"দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং"—

গণপতি এখানে ভক্তের পরমশত্রু অসুরগণকে কিভাবে বিনাশ করিয়া তাহাদের পরম হিতসাধন করেন, তাহার একটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। পুরাণোক্ত বর্ণনা পড়িলে মনে হয় গণেশ যেমন চিত্তাকর্ষক, ঠিক তেমনি ভাবে ভক্তজনের গণের পরিরক্ষণে বিশেষভাবে দক্ষ। এই দুইটি ভাবের মধ্য দিয়া গণপতির দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সামর্থ্য দ্যোতিত হইল।

"শৈলসুতাসুতপতিম্" শব্দ দ্বারা জননায়ককে শুধু সমাজনায়ক না করিয়া অশিক্ষিত গুহাপর্ব্বতঅরণ্যবাসী জনসাধারণের নায়করূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। "সিদ্ধিপ্রদং" গণেশ সিদ্ধিদাতা। জনসাধারণকে বশীভূত চালিত স্বধর্ম্ম-

পালনে রত করিতে না পারিলে যে কোনও কাজে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝা যায়। No success is possible without the help of the leader of the mass.

সাধকের নিকট গণেশ গণের দেহের জগতের ভিন্ন ভিন্ন চক্রস্থ দেবতাগণের অধীশ সমস্ত তত্ত্বগুলিকে কার্যোপযোগী করিয়া তুলিতে তিনি বিশেষভাবে দক্ষ—সুতরাং তিনি সিদ্ধিদাতা। আর ঐতিহাসিক ভাবে গণেশ জনসাধারণকে সুপথে চালিত করিয়া দেশের জগতের মঙ্গলসাধনে তৎপর।

"কামদং" সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ করিতে, এমন কি দেশের জাতীয় কল্যাণ সাধন করিতে সাধারণের গণনেতার সাহায্য সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। এইরূপে গণেশের ধ্যানের ভিতর হইতে জনসাধারণের জননায়কের গুণ ও স্বভাবের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

এখন গণেশের পূজার কথা একটু ভাবিয়া দেখা যাক্। পূজার উপচারগুলি যে জীবনধারণে প্রীতিসম্পাদনে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে জনসাধারণকে দেশের কাজে ভগবৎইচ্ছাপূরণে লাগাইতে হইবে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের পানীয় জলের বিশুদ্ধ বায়ুর স্বাস্থ্যসম্পাদনের রোগনিবারণের জ্ঞানবৃদ্ধির আনন্দসম্পাদনের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া না দিলে চলিবে কেন? গণপতিকে গণনায়ককে জানাইয়া দিতে হইবে যে,

তাঁহার চালিত জনসাধারণ নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে পড়িলেও কষ্টভোগ করিবে না; উপরন্তু তাহাদের জীবন-ধারণের আত্মার কল্যাণের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। গণেশ তৃপ্ত হইলে তাঁহার গণ সন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের ধর্ম্মের উন্নতি যে কত সহজ ও স্বাভাবিক, তাহা সুধীগণ ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হইবে না। পাশ্চাত্য সেনাপতিগণ কিভাবে সাধারণ সৈন্যদের সব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের সুখশান্তির আরামের ব্যবস্থা করিতে তৎপর থাকেন, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

সাধকের নিকট গণেশ সব তত্ত্বের চালক তাই সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ পূর্ণতাপ্রাপ্তি সব তত্ত্বে ভগবৎঅনুভূতি গণেশের কৃপাসাপেক্ষ।

বোধ হয় বুঝিতে পারা গেল, হিন্দুগণ কেন সর্ব্বপ্রথমেই গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি ব্যাপারে আনন্দ করিতেন ভোগ করিতেন বড় বড় রাজা-মহারাজারা পণ্ডিতদেবতারা—সাধারণ লোক সেখানে কেহই নয়। গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহাদের আনন্দবৃদ্ধির কারণ হওয়া ছাড়া যজ্ঞাদি ব্যাপারে তাহাদের আর কোনও রকমের অধিকার ছিল না, হাত ছিল না। মঙ্গলময় শিব ইহা কি করিয়া সহ্য করিবেন! তাঁহার বাস গুহায় গহ্বরে শ্মশানে মশানে, তাঁতাব সঙ্গী ভূতপ্রেত

কোলভীল—সমাজে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য চণ্ডাল-জাতি। যার কেহ নাই শিব যে তাহারই। যাহা কেহ চায় না তাহাই তাঁহার ভূষণ, যে সকলের ত্যাজ্য সে-ই শিবের সঙ্গী। মঙ্গলময় তেলামাথায় তেল ঢালিতে ভাল বাসেন না। তাঁহার দৃষ্টি সাধারণ গণ-সমূহের উপরে, তাঁহার কাজ সাধারণ জনগণের সেবায়। তাইতো তিনি নিজের সহধর্ম্মিণীকে অন্নপূর্ণার কাজে নিযুক্ত করিলেন; বলিয়া দিলেন—তুমি জগতের মাতা, গরীব দুঃখী অনাথা সব যে তোমার নিজের সন্তান। দেখিও, তোমার রাজ্যে কেহ যেন অনাহারে মারা না যায়। নিজের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রকলহ আদি মস্তিষ্কের বিকৃতিসাধক কাজ হইতে দূরে নিয়া জনসাধারণের হিতসাধনে তাহার সমস্ত জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিকে নিযুক্ত করিয়া জনসাধারণের সেবার জন্য কল্যাণের জন্য আনন্দের জন্য গণেশকে গণপতিরূপে গণনায়করূপে নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে—মাথা গিয়াছে, ইনি সাধারণ হস্তীর ন্যায় তামসিক মস্তিষ্ক লাভ করিয়া সাধারণের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। পণ্ডিতসমাজ যেমন গণপতিকে ত্যাগ করিতে বসিলেন, জ্ঞানাধার আগম-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক জগতের পরম কল্যাণকারী দেবাদিদেব মহাদেবও অমনি গণেশের পূজা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য, সাধারণের সেবা গরীবের সেবা সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া বলিয়া গেলেন যে "গণেশের

পূজার পূর্ব্বে যে দেবতার পূজা হইবে তাহা নিষ্ফল”। সাধারণ জীবের সেবাই শিবের সেবা। রাজামহারাজা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দিক হইতে শিবের দৃষ্টি গিয়া পড়িল অনাথগরীবদের উপরে, কোলভীলসাঁওতালদের উপরে, পতিতচণ্ডালদের উপরে, ভূতপ্রেতপিশাচ বলিয়া ঘৃণিত ত্যক্ত অস্পৃশ্য জনসাধারণের উপরে। ইহা দ্বারাই যে শিবের শিবত্ব, শিবনাম সার্থক হইয়া পড়িল।

সাধনরাজ্যে দেবাদিদেব কাহাকেও অগ্রাহ্য করেন না। তামসিক প্রকৃতির সাধকগণ এমন ভাবে জগতে আর কোথাও আদর পান না, ঐতিহাসিক ভাবে আর কোনও দেবতা আচণ্ডালে এমন ভাবে প্রেম বিলাইতে সমর্থ নন।

গণেশ উভয় ভাবে এই মঙ্গলময় শিবের প্রধান যন্ত্র প্রধান সহায়।

গণেশ কলাবধূর স্বামী, বৈশ্য ও শূদ্র-শক্তির সাহায্যে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা (art and industry) আবিষ্কার করিয়া জগতের কল্যাণসাধনের সিদ্ধিলাভের সহায় হইয়া পড়িলেন। তিনি কলাবধূর স্বামী, কলাবিদ্যার স্থাপয়িতা ও রক্ষাকর্ত্তা (master of art and industry)। গণেশ মূষিকবাহন—মুষ্ণাতি কর্ম্মফলং ইতি মূষিকঃ—নিষ্কাম কর্ম্ম যে সিদ্ধিদানের পরম সহায় নিষ্কাম কর্ম্ম যে সিদ্ধিকে বহন করিয়া আনে, বাহনটি সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিল।

সরস্বতীপূজা

সরস্বতী শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হইতে আমরা জানিতে পারি সরস্বতী প্রশস্তজল-বিশিষ্টা নদীবিশেষ ; এবং কারণসলিলে অধিষ্ঠিতা ব্রহ্মবিদ্যা। সরো নীরং তদ্বং, সরো বা অস্তি অস্যা ইতি সরস্ মতুপ্। ঋগ্বেদে সরস্বতী-শব্দের বহুস্থানে বহুভাবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ইনি প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনধারণের উপায়। বাজসনেয় সংহিতায় (১৯।৯৩), শতপথ ব্রাহ্মণে (৯।৬।২৪) ও সায়ণ-ভাষ্যে ইহার বহু প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সব স্থানেও সরস্বতী শব্দের নদী ও ব্রহ্মবিদ্যা, উভয় ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণে সরস্বতী কোথাও ব্রহ্মার পত্নী কোথাও বা তাঁহার কন্যাভাবে বর্ণিতা, আবার কোথাও হরিপ্রিয়া বলিয়া প্রশংসিতা। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মশক্তি, সুতরাং ব্রহ্মেরই পত্নী ভগবৎচিদ্বিভূতি। আধিভৌতিক ভাবে ইনি অন্যান্য সব পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মসম্ভূতা সুতরাং ব্রহ্মার দুহিতা।

সকল ভাবেই যে ইনি হরিপ্রিয়া ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনে ব্রহ্মজ্ঞানাস্বাদনে নিযুক্তা, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। প্রাচীন ঋষিগণ প্রকৃতিকে বড়ই ভাল বাসিতেন। নদী-পর্ব্বতগুলি তাঁহাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিত। নদী-পর্ব্বতগুলির মধ্য দিয়া ভগবৎকৃপা-মাধুর্য্য তাঁহাদের অনুভবে আসিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতির সাহায্য করিত। নদী তাঁহাদের নিকট ভগবৎলীলা-বিভূতি। নদীর ভিতরকার অধিষ্ঠিত চৈতন্য তাঁহাদের নিকট মা-আদ্যাশক্তি, ভগবতী-রূপে পূজা পাওয়ার যোগ্যা।

শীত ঋতুর প্রকোপ চলিয়া গিয়াছে, বসন্ত ঋতু আস্তে আস্তে আপন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে জগৎকে যেন পরিপ্লাবিত করিয়া আনন্দময়ের আনন্দ-লীলার সহায় হইতে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সমষ্টি-প্রকৃতির সঙ্গে ব্যষ্টি-প্রকৃতির অতি নিকট সম্বন্ধ, তাই ব্যষ্টি-জীবদেহেও যেন বসন্তের আগমনের একটা চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তারপরে বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের বেশ একটা সুন্দর যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি একটু খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই বহির্জগতের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ইহার কারণরূপ অন্তর্জগতের ভাবরাজ্যের একটা পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক যুগের ঋষিগণ এই শুভ দিনে প্রকৃতির এই ভিতর-বাহিরের একটা সুন্দর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সমাধিযোগে যে অপূর্ব্ব রহস্য

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাই ভাষায় বাগ্‌দেবীরূপে শিল্পে সরস্বতীরূপে প্রকাশ পাইল। মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীর দিনে প্রাচীন ঋষি এই তত্ত্ব এই ব্রহ্মবিদ্যা এই ভগবৎচিদ্বিভূতি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া ঋষি ভক্ত আর্য্যগণ ঐ দিনকে জ্ঞানবিকাশের প্রধান অনুকূল দিন মনে করিয়া একটা প্রধান উৎসব-দিনরূপে গ্রহণ করিলেন। যে মাসে যে তিথিতে যে দিনে কোনও একটা বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, সেই দিনটি যে সেই তত্ত্ব-বিকাশের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোনও বস্তুর উপলব্ধি সম্বন্ধে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ের অনুকূল অবস্থাই সেই কাজকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলে। দ্রষ্টা দেখিবার জন্য প্রস্তুত অথচ দৃশ্য বহু আবরণে আবৃত, কিংবা দৃশ্য আবরণ-মুক্ত আপন স্বরূপপ্রকাশে ইচ্ছুক অথচ দ্রষ্টা অন্যমনস্ক, এই উভয় অবস্থাতেই দর্শন-কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ঐ দিনের দ্রষ্টা ছিলেন অপরোক্ষ-দর্শনে সমর্থ ঋষিগণ এবং দৃশ্যও ছিলেন প্রকৃতির যাবতীয় সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে ভরপূর। এইভাবে দৃশ্যের মধ্য দিয়া শ্রীভগবান যেন বিশেষভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাইতো দর্শন-কার্য্যটী সেদিন এমন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, যাহার স্মরণ আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়, যে দিনকে আমরাও একটা উৎসবের

দিনে পরিণত করিয়া প্রাচীন ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যা আবিষ্কারের সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরাও ঐভাবে ভগবানের চিৎবিভূতি আস্বাদ করিতে আজ এইভাবে সচেষ্ট হইয়াছি। হিন্দুগণ কেন যে দেশবিশেষকে পাত্রবিশেষকে কালবিশেষকে এত শ্রদ্ধাভক্তির চোখে দেখেন, তাহার হেতুসন্ধানে জ্ঞানীর চোখে অনেকখানি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, সরস্বতীর তত্ত্বটি কি—তাঁহার মূর্ত্তি ও পূজাপ্রণালীর মধ্য দিয়া আমরা কি রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হই। সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ্‌প্রত্যয় নিষ্পন্ন করিয়া সরস্বতী শব্দ সাধিত হইয়াছে। জীবের চিত্তরূপ সরোবরে যিনি বর্ত্তমান থাকিয়া শোভিত রহিয়া জীবের সমস্ত কার্য্যকলাপের পথপ্রদর্শক, ভগবানের সেই জ্ঞানস্বরূপা চিৎবিভূতিই দেবী সরস্বতী; অথবা সাধক যোগী ঋষিগণ সমাধিযোগে চিত্তরূপ সরোবরকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া সেখানে শ্রীভগবানের অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব যেভাবে যে মূর্ত্তিতে দর্শন করেন, তাহাই দেবী সরস্বতী। সুতরাং সরস্বতী শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি, সরস্বতী ব্রহ্ম-বিদ্যা।

সাধকহৃদয়ে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা পরাজ্ঞানরূপে উদিত হইলেন বলিয়া অসাধক সাধারণ জীব কি মায়ের কৃপালাভে বঞ্চিত থাকিবে? মা সকলের সম্বন্ধে সমভাবাপন্ন

হইলেও আপন আপন অধিকার অনুসারে যে যতটা উপযুক্ত যে যেরূপ অভিরুচিসম্পন্ন, মা তাহার নিকটে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাই ঋষিদের পরাবিদ্যা সাধারণ সাধকদের নিকটে অপরা বিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া জগতের দর্শন-বিজ্ঞান আদি যাবতীয় শাস্ত্র-রূপে আপন মহিমা প্রকাশ করিতে বসিলেন। স্বরূপতঃ মা আমার পরাবিদ্যা, যাহা বিশুদ্ধ স্বচ্ছ শুদ্ধ চিত্তে সাত্ত্বিক পরিণতির চরম অবস্থায় প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণ শুভ্র, তাই মাও যে আমার শুভ্রবর্ণা—স্বরূপতঃ অবর্ণ হইলেও শুভ্ররূপে প্রতীয়মানা শুভ্ররূপে দর্শনযোগ্যা।

মায়ের এক হাতে বীণাযন্ত্র অপর হস্তে বেদগ্রন্থ। এই বীণাযন্ত্র কম্পনাত্মক নাদশক্তির প্রতীকরূপে কি ভাবে কম্পনাত্মক ছন্দোরহস্য হইতে জগতের যাবতীয় শব্দ যাবতীয় তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, তাহারই একটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই বেদগ্রন্থ ভগবৎচিদ্বিভূতির প্রতীক-রূপে শ্রীভগবানের অনন্ত জ্ঞান এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রণালীগুলি জগতের প্রত্যেক পরমাণুর গায়ে গায়ে তিনি কি ভাবে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া থাকে।

মায়ের বাহনটি হংস। সাধক জানেন "অহং সঃ" এবং "সঃ অহং" এই দুইটি তত্ত্ব অতি অদ্ভুতরূপে মিলিত হইয়া এই হংসমন্ত্র—হংসতত্ত্ব সাধিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে দ্বৈত ও

অদ্বৈতজ্ঞানীর উভয় মতেরই পরম সারতত্ত্ব নিহিত আছে। দ্বৈতবাদী 'অহং'রূপী জীবাত্মাকে শুদ্ধ করিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবৎদাসরূপে অনুভব করিয়া আত্মনিবেদনরূপ সাধনা দ্বারা সাধনার চরম ফল লাভ করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদী ইহার সাহায্যে 'ত্বং'পদার্থকে শুদ্ধ করিয়া 'তৎ'পদার্থে পরিণত করিয়া 'তৎ'পদার্থরূপে জানিয়া 'তত্ত্বমসি' ভাবের সাধনা দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্বসাধন করেন। যোগীগণের নিকট এই হংসতত্ত্বের অপর নাম অজপাসাধনা। ইহার সাহায্যে তাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে মূলাধার ও সহস্রারে যাতায়াত দ্বারা পরিশেষে সহস্রারে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার চরম একতা উপলব্ধি করেন।

শিক্ষা কল্প ছন্দ জ্যোতিষ গণিত বিজ্ঞান দর্শন আদির সাধক মায়ের অপরা মূর্ত্তির অপরা তত্ত্বের অপরা বিদ্যার সাধক। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বৈতাদ্বৈত-সাধকগণ মায়ের পরা মূর্ত্তির পরাতত্ত্বের সাধক। ইহাঁরা আপনাদিগকে হংসরূপে কল্পনা করিয়া হংসতত্ত্বের হংসমন্ত্রের সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। হংস সম্বন্ধে একটা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, হংস দুধ ও জল-মিশ্রিত পদার্থ হইতে জলের ভাগ ত্যাগ করিয়া শুধু দুধের ভাগ গ্রহণ করে "হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং"। সংসার সুখদুঃখ ভালমন্দ সৎঅসৎ শত্রুমিত্র দেবাসুরআদি দ্বন্দ্বভাবে পরিপূর্ণ। যিনি ইহার মধ্যে মন্দটিকে বাদ দিয়া শুধু ভালটিকে

গ্রহণ করিতে সমর্থ, সব জিনিসের মধ্যে সত্যের ভাব আনন্দের ভাব ভগবানের ভাবের দিকে যাহার লক্ষ্য, তিনিই মা সরস্বতীর ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক—তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। কোনও জীবই মায়ের সাধনতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত নহে, সকল জীবকেই মাকে ডাকিবার মাকে পাইবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

মায়ের মূর্ত্তি মায়ের পূজাপ্রণালী আমাদের মত তামসিক স্বার্থপর লোকদের হাতে পাড়িয়া অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িলেও ইহার মধ্যে এমন অনেক রহস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষ জ্ঞানলাভে ব্রহ্মবিদ্যাসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। মনে রাখিতে হইবে উপাসনা দ্বারা মানুষ উপাস্যের নিকটবর্ত্তী হয়, উপাস্যের ভাবে ভাবিত হইয়া তদ্রূপতা তৎসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। যে যাহার পূজা করে সে তাহার স্বরূপচিন্তন স্বরূপধ্যান করিতে করিতে অন্য সব কথা ভাব ও সংস্কার বিস্মৃত হয় —এমন কি, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। সেই অবস্থায় উপাস্যের বিমল প্রতিবিম্ব উপাসকের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া উপাসককে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া তৎসদৃশ করিয়া তোলে। পূজাকে সাধনাকে আমরা আজকাল যে ভাবে একটা তামসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়াছি, তাহা দ্বারা কোনও সাত্ত্বিক ফল আশা করা যায় না; তবে সাত্ত্বিক ফল দেখিতে না পাইয়া সমস্ত পূজাতত্ত্বকে

সাধনরহস্যকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া আমরা যে কতরূপে কতভাবে বঞ্চিত হই, তাহাও আমরা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সরস্বতী দেবীকে কেন যে বিশ্বরূপা ও বিশালাক্ষী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও একটু চিন্তা করা ভাল। বৈজ্ঞানিকগণ জানেন কম্পন হইতে ছন্দতত্ত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি। একই পদার্থ বিবিধ ভাবের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া বিবিধ তত্ত্ব বিবিধ পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ বলেন একই ব্রহ্মপদার্থ যে কারণেই হউক না কেন, এই বিচিত্র জীবজগৎ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। আমরা যত কিছু রূপ দেখি তাহার সবই যে সেই অরূপীর রূপ, যত কিছু শব্দ শুনি তাহার সবই যে আমার সেই প্রিয়তমের নাম। উপনিষদ যাঁহাকে 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' বলিয়াছেন, সরস্বতীর ভক্তগণ তাঁহাকেই বিশালাক্ষী নামে সম্বোধন করেন। ভারতে এমন অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, অতি মূর্খও দেবী সরস্বতীর সাধনা করিয়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। পূজাটা ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কেন যে জ্ঞানলাভ হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।...

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে সরস্বতীপূজা না হইলে সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিয়া কুল খাইতে নাই। জ্ঞানের চরম অবস্থায় সিদ্ধ-মহাত্মাগণকে আর দেশ-কাল-

পাত্রের সব বিধি-ব্যবস্থাগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা হয় না,—তখন যে তাঁহারা মুক্ত, তখন যে তাঁহারা স্বাধীন ; তাই কুল ত্যাগ করিতে কুল খাইতে তখনই তাঁহারা সমর্থ হন। অকুলের কাণ্ডারীকে লাভ করিয়া বৃন্দাবনের গোপীগণ একদিন বলিয়াছিলেন "কি করিবে কুলের কুকুরে ?" এজন্য কুল-শীলে জলাঞ্জলি দিতে তাঁহারা তখন আর দ্বিধাবোধ করেন না। গীতায় "হত্বাঽপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" শ্লোকটিও বোধ হয় এই ভাব প্রকাশ করে। বিধিমার্গরূপ কুলকে সামান্য একটা গাছের ফলে পর্য্যবসিত করিয়া আজ আমরা যে একান্তই হাস্যাস্পদ হইতে বসিয়াছি।

বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবাদ আছে যে সরস্বতীপূজার দিন পড়িতে নাই—পড়াশুনা বন্ধ রাখিতে হয়। সরস্বতী পরাবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা নিত্যসিদ্ধ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ জ্ঞান ; আবরণক্ষয়ে শুদ্ধচিত্তে আপনা হইতে ইহা ফুটিয়া বাহির হয়। ইহা বিষয়জনিত জ্ঞান হইতে পুস্তকগত বিদ্যা হইতে লাভ করা যায় না। "ন প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন" ইহা বেদপাঠ দ্বারা মেধা দ্বারা উপদেশের দ্বারা লভ্য নয় ; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" তিনি নিজে যাহাকে বরণ করেন, সে-ই ইহাঁকে লাভ করে। বই পড়িয়া আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান (Experimental knowledge) লাভ করি। এই জ্ঞান অনেক সময় প্রকৃত জ্ঞানকে

ঢাকিয়া রাখে। গীতায় বিষয়জনিত সুখকে 'আগমাপায়ি' বলিয়া নিন্দা করিয়া অতীন্দ্রিয় আত্মসুখের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার বই জগৎ—গ্রন্থ স্বভাব, যাহা ঋষিগণ দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেন; আমাদের পরিচিত সাধারণ গ্রন্থগুলি সেই জ্ঞানের অনুবাদ মাত্র। সাধনার শেষ অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারলাভে সরস্বতীর সাধকের নিকট সেগুলি শেষে আর ভাল লাগে না। ব্রহ্মবিদ্যার আগমনে বইগুলি পড়াগুলি যেন আপনা হইতে খসিয়া পড়ে। এখন সেইভাবটা অস্বাভাবিক ভাবে জোর করিয়া আনিতে চেষ্টা করা হয়। সন্ন্যাসীদের চাতুর্ম্মাস্য জটা ও বিভূতিধারণ, যীশুর রক্ত বিনা মুক্তি অসম্ভব—কাম-ক্রোধাদির বলিদান আদি কিরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এখন বিধির সাহায্যে সরস্বতী পূজার দিন লেখাপড়া বন্ধ রাখিতে হয়! লেখাপড়া শিক্ষা করাই যাঁহার আরাধনা, আজ পূজায় সাহায্য পাওয়া যাইবে না বলিয়া সেই পূজায় অনধ্যায়ের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবরাত্রি

আজ শিবরাত্রি। বসন্তের প্রারম্ভে হোলির পূর্ব্বে বসন্তপঞ্চমীর পরে এই শিবরাত্রি আমাকে বড় আনন্দ দিয়া থাকে। তাহাতে এখন আমি রহিয়াছি কাশীতে। "কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে, সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা" শ্লোকটি স্মরণ কর। "কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন-জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা" শ্লোকটীও মনে রাখিও। বুঝিতে চেষ্টা কর, কাশী কেন দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূলের প্রকৃতির তিনগুণের উপরে উর্দ্ধে গুণাতীত প্রদেশে অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামে অবস্থিত। "শান্তং শিবমদ্বৈতং যৎ চতুর্থং মন্যতে" সেই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের অতীত চতুর্থ তত্ত্ব অকার-উকার-মকারের উপরকার অর্দ্ধমাত্রা অব্যক্তাবস্থা যে শিবতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণজগৎরূপিণী শ্যামা মা আমার যে শবরূপী অব্যক্ত অচিন্ত্য শিবের বক্ষোপরে থাকিয়া সাকার সগুণ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। সেই মার আধার সেই মার পরমাত্মা সেই মার অন্তরাত্মা যে শিব, তাহা বোঝা তত সহজ কথা নয়।

শিব বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব, সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব, যোগীর

সহস্রারস্থিত প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা; সমস্ত দর্শনশাস্ত্র যাহাকে বাক্যমনের অগোচর জানিয়া 'নেতি' 'নেতি' শব্দ দ্বারা কতকটা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেই পরম তত্ত্ব। শিবরাত্রির দিন উপবাস করিয়া শিবপূজা করিতে হয়, শিবকে সাক্ষাৎকার করিতে হয়। উপবাস জিনিসটা কিন্তু তত সহজ নহে। উপবাসের মুখ্য অর্থ উপাসনা, উপ অর্থাৎ সমীপে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করা অর্থাৎ আসীন থাকা; যেমন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার সান্নিধ্যে অবস্থান করাই মুখ্য একাদশীর উপবাস। একাদশ ইন্দ্রিয় একাজের প্রধান বিঘ্ন। তাহারা মনকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া ভগবৎসান্নিধ্যজনিত আনন্দরসে বঞ্চিত করে; এজন্য একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, বিষয়ভোগ হইতে দূরে রাখাও সূক্ষ্ম ভাবের একাদশীর উপবাস। উপবাসী রাখিতে হইবে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে! আমাদের উপবাস শুধু পেটকে উপবাসী রাখায় পর্য্যবসিত; কারণ আমরা এখন একান্তই যে পেটুক, পেট-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে না খেয়ে যত লোক মরে, বেশী খেয়ে কুপথ্য খেয়ে তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক মরিয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে—আমাদের দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বিষয়রূপ খাদ্যরস আস্বাদ করিতে দিলে তখন আমাদের জীবাত্মা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ও সংস্কার নিয়া এত ব্যস্ত এত আসক্ত হইয়া পড়ে যে, তখন আর সে

সেই "অবাঙ্‌মনসোগোচরং" চতুর্থ তত্ত্বরূপ শিবরহস্য ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। চোখের আহার রূপ, কানের আহার শব্দ, মনের আহার সংস্কার ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিআদি দ্বারা যাহা কিছু গৃহীত হয় তাহাই যে আহার "আহ্রিয়তে মনসা বুদ্ধ্যা ইন্দ্রিয়ৈর্যঃ স আহারঃ"। অসংযত চোখ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন না করিয়া বিষয়কে দর্শন করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাই তাহাকে সংযত করিয়া শোধন করিয়া এমন করিয়া তুলিতে হইবে যাহার ফলে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি" স্বাভাবিক হইয়া যায়। জগতে যত কিছু শব্দ তাহার সবই যে সেই কালার মোহন শব্দ-ব্রহ্ম বেণুর রব ছাড়া আর কিছুই নয়, অথচ আমাদের অসংযত কান সেখানে কত কি অনর্থ বিষয়-ধ্বনি শুনিয়া মোহিত হয়। এইভাবে আমাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের এবং মনের উপরকার সমস্ত আবরণ অজ্ঞানতা আসক্তির রং দূর করিয়া ইহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ইহাদিগকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির ভগবৎঅনুভূতির সহায় করিয়া তুলিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ইহারা পীড়িত বিকারগ্রস্ত, সে পর্য্যন্ত ইহাদের সংযম একান্ত আবশ্যক—সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বিষয় ও বিষয়জনিত সংস্কার-রূপ আহারগ্রহণে বঞ্চিত রাখিতে হইবে। এ অবস্থায় 'নেতি' 'নেতি' ভাবের সাধন একান্ত আবশ্যক—ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের প্রত্যাহার করা কর্ত্তব্য। পাত্রে ত্রিবিধ দেহে

সাংসারিক ময়লা জমে রয়েছে, তাহাতে ব্রহ্মানন্দ-রস কি করিয়া রাখা চলে! রাখিলেও যে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সাবান দ্বারা (বিচার দ্বারা বৈরাগ্য দ্বারা উপবাস দ্বারা) পাত্র পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

পার্ব্বতীর তপস্যা শিবের মদনভস্ম না হলে তাহাদের পরিণতি মিলন আনন্দ-আস্বাদন হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নহে। অসংযত ইন্দ্রিয় অশান্ত দুষ্ট মন ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান প্রতিবন্ধক, এজন্য হিন্দুদের সব শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযমের উপবাসের ব্যবস্থা দেখা যায়। তোমরা শিবচতুর্দ্দশীর দিন শিবপূজার জন্য সেইভাবে উপবাস-সংযম সাধন করিয়াছিলে কি? না সাধারণ লোকের ন্যায় শুধু পেটটিকে উপবাসী রাখিয়া—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে মনকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে যথেচ্ছ বিষয়োপভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলে? প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক বিষয়কে, বিষয়-জনিত সুখকে পরমপদপ্রাপ্তির, পরমানন্দলাভের প্রধান বিঘ্ন জানিয়া ইহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভগবৎআরাধনার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াদির উপবাস সংযম নিরোধ একান্ত আবশ্যক।

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমরা ভগবানে তন্ময়ভাবে অবস্থিত ছিলাম, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই পরমাত্মাকে ছাড়িয়া বাহিরে বিষয়রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সৃষ্টির অতীত অবস্থা কতকটা রাত্রির মতন, সৃষ্টির অবস্থা অনে-

কাংশে ঠিক দিনের মতন। দিনের বেলা আমাদের মন আমাদের আত্মার কাছ হইতে ভিতর হইতে বিষয়গ্রহণে বাহিরে ছুটিয়া যায়, বিষয়ানন্দে মগ্ন থাকে ; রাত্রে আবার সে সব বিষয় ছাড়িয়া পুনরায় আত্মার দিকে, পরমাত্মার দিকে, শিবের দিকে ছুটিয়া আইসে। আমাদের মনটা দিনে যায় আলোর দিকে, সৃষ্টির দিকে, ভেদভাবের দিকে, বহুর দিকে, জগতের দিকে, কর্ম্মকাণ্ডের দিকে ; রাত্রে আবার ফিরিয়া আইসে অন্ধকারের দিকে, লয়ের দিকে, অভেদের দিকে, একের দিকে, পরমাত্মার দিকে, প্রেমের দিকে। দিনে যায় কারণ হইতে কার্য্যের দিকে, রাত্রে ফিরিয়া আইসে কার্য্য হইতে কারণের দিকে। দিনটা জন্মের—জীবিতকালের, রাত্রিটা মৃত্যুর—পরকালের দ্যোতক। রাত্রি ভোর হইবামাত্র প্রকৃতি-মা জেগে উঠেন, কাজ করিতে চলেন ; তাঁহার সন্তানগুলির ভিতরেও একটা কার্য্যোন্মুখী প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ করে। আবার সন্ধ্যার সময় প্রকৃতি-দেবী তাঁহার সব কাজ ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে, তাঁহার পরমস্বামীতে আত্মনিবেদন করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করিতে সচেষ্ট হন, আর সেই সঙ্গে মার সমস্ত ছেলেমেয়েরাও তাহাদের আপনাপন মাতৃক্রোড়ে গিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতে চেষ্টা করে। দিনের বেলা আমরা মাকে ছাড়িয়া সংসারে গিয়া পৃথক পৃথক স্বার্থ নিয়া পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হই ; তারপরে রাত্র্যাগমে সে সব

সংসারের খেলা বিবাদ-বিসংবাদ ছাড়িয়া আবার মার কাছে গিয়া সব ভাই-বোনদের আত্মীয় জানিয়া আপনাপন স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থপর হইয়া প্রকৃত স্বার্থ যে কি, তাহা অনুভব করিয়া—ভাই-বোনদের সেবাই যে মার সেবা, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, সকলের কল্যাণসাধনেই যে প্রকৃত কল্যাণ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মঙ্গলময়ের সেবায় শিবের সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া মার কোলে আনন্দসমাধিতে ঢলিয়া পড়ি। রাত্রে মার কাছে সকল ভাই-বোনদের একসঙ্গে একত্র দেখিতে না পাইলে সকলের ভিতরে সেই আসল মার পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিতে না পারিলে, জীবের সেবাই যে শিবের সেবা, এ তত্ত্ব আস্বাদ করিতে না পারিলে আমরা যে কখনও মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে, শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে অগ্রাহ্য করিতে সচেষ্ট হইতে পারিতাম না।

শিবের সাধনার জন্য সমাধির ভগবানে আত্ম-সমর্পণের সর্ব্বত্র আত্মানুভূতির সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের একান্ত আবশ্যক ' এ জন্য শিবের সাধনা সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ রাত্রে, দিনে নহে। একবার রাত্রে সমাধিযোগে শিবকে দেখিয়া শিবকে পাইয়া শিবকে জানিয়া তারপরে দিনে জাগ্রতাবস্থায় সব ভাবের ভিতর দিয়া সব কাজের ভিতর দিয়া শিবের সাধনা, নিজের ও অপর সকলের প্রকৃত কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকা—জীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ

করা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। রাত্রিই যে প্রেম-সাধনার আত্মনিবেদনের একাত্মানুভূতির প্রশস্ত সময়। এখন বুঝিতে পারিলে কেন শিবরাত্রির উপবাস করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন সব ইন্দ্রিয়গুলিকে উপবাস করাইয়া সংযত রাখিয়া প্রেমসাধনা দ্বারা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া একাত্মানুভূতি দ্বারা নিজের ও অপর সকলের মঙ্গলসাধনে শিবের আরাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। শিবনাম জপ করা শিবপূজা করাও যে তত সহজ কথা নয়। পাতঞ্জল কেন বলিয়াছেন "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যে পর্য্যন্ত সব কাজের ও সব ভাবের মধ্য দিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত দেখিতে না পাইবে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত আপদবিপদ—এমন কি, মৃত্যুর মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা না উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানকে মঙ্গলময় শিবভাবে ভাবিতে ডাকিতে প্রচার করিতে তোমার অধিকার নাই। তারপরে যে পর্য্যন্ত তোমার কোনও কথা ভাব ও কাজ, কোনও জীবের অকল্যাণসাধনে ব্যাপৃত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার পূজা শিবের মঙ্গলময়ের কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে না। যাঁহার জীবন জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার দ্বারাই শিবপূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে। শিব-রাত্রির ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়, শিবের জন্য উপবাস ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়; চতুর্দ্দশীর দিনে ব্রত-উপবাস-

পূজা, আর পারণা পূর্ণতালাভ পূর্ণ পরিণতি অমাবস্যার দিনে।

অমাবস্যা কাহাকে বলে একটু বুঝিতে চেষ্টা কর। স্থূলভাবে অমা অর্থাৎ সহ বাস করে অর্ক ও ইন্দু এই তিথিতে, এই অর্থে অমা পূর্ব্বক বস্ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া অমাবস্যা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের একত্র বাস একত্রাবস্থান অর্থাৎ মিলন সাধিত হয়, জ্যোতিষের মতে ব্যাকরণের মতে তাহাই অমাবস্যা। সূক্ষ্মভাবে সাধনরাজ্যে অর্ক ও ইন্দু অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা একত্র মিলিত হন—একত্র অবস্থিতি করেন যে অবস্থায়, সেই সমাধির অবস্থার নাম অমাবস্যা। ইন্দ্রিয় মনে, মন আত্মায়, আত্মা পরমাত্মায় যখন লীন হয়, সেই সমাধি অবস্থা, আত্মনিবেদনের অবস্থাই কালীপূজার, শক্তিআরাধনার প্রেমসাধনার প্রশস্ত সময়। এই পূর্ণ সমাধির অবস্থায়, একাত্মানুভূতির যোগে সেব্য-সেবক ভেদভাব এবং তৎসম্বন্ধীয় কোনও কর্ত্তব্যসম্পাদনের অবসর থাকে না বলিয়া চতুর্দ্দশীতে অর্থাৎ পূর্ণ-সমাধির একটু পূর্ব্বে সামান্য একটু ভেদভাব থাকিতে থাকিতে উপবাস করিবার উপাসনা করিবার আরাধনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে সাধনা দ্বারা 'নেতি' 'নেতি' ভাবের সাধনা পূর্ণ করিয়া অমাবস্যায় জীবব্রহ্মের পূর্ণ মিলন সাধিত করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমস্ত তত্ত্ব-

গুলিকে ভগবৎসত্ত্বা দ্বারা পূর্ণভাবে ভাবিত করিয়া সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপকে আস্বাদ করিয়া "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে 'নেতি' 'নেতি' সাধনা দ্বারা উপবাস করান হইয়াছিল, সমাধিযোগে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি দ্বারা পারণা দ্বারা তাহাদিগকে তৃপ্ত করাইয়া ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া পূর্ণ করিয়া তোলা হইল। এই পারণার ফলেই তো সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্" "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি" স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। একদিন বৃন্দাবনে গোপীগণ কাত্যায়নীপূজার পরে বস্ত্রহরণান্তে পারণা দ্বারা জগতের সমস্ত তত্ত্বকে তাহাদের প্রাণারাম কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা পরিপূরিত দর্শন করিয়াছিলেন। "রূপে ভরল দিঠি" গানটী স্মরণ কর। শ্রীরাধার দর্শনইন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ দ্বারা এমন ভাবে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি কৃষ্ণরূপ ছাড়া আর অন্য কোনও রূপ দর্শন করিতে পারিতেন না। তাঁহার কর্ণযুগল মোহন মুরলীরবে এমন ভাবে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছিল যে, তখন "না শুনে আন পরসঙ্গ" অন্য কথা শুনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। নাসিকা কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে এমন উন্মত্ত হইয়াছিল যে, অন্য কোন গন্ধ তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। তাঁহার বদন শ্রীকৃষ্ণ নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মন কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে এমন ভাবে

নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়ের চিন্তা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় "ঋষিকেণ ঋষিকেশসেবনং" রূপ উত্তম ভক্তি যে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় কর্ম্মমাত্রই যে সাধনায় ভগবৎআরাধনায় ভগবৎসেবায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। উপবাস করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া 'নেতি' 'নেতি' ভাবের সাধন দ্বারা সাধনা আরম্ভ করিয়া পারণা দ্বারা সেই সাধনার পূর্ণাবস্থায় 'ইতি' 'ইতি' ভাব দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতির ফলে সিদ্ধাবস্থা লাভ করা হয়। অমাবস্যায় প্রাকৃত ভাবসমূহের প্রাকৃত জীব-লীলার অবসান হয়, সমস্ত কামনা বাসনা সংস্কার জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া চিত্তভূমিকে শশ্মানে পরিণত করা হয়; তখন প্রাকৃত জগতের সব তত্ত্ব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত লয়প্রাপ্ত হয়, ভগবান বুদ্ধের শূন্যবাদ-সাধনায় জাগতিক সব তত্ত্বের শূন্যে সমাধান-সাধন শেষ হইয়া যায়। ইহার পর সাধনার আর কিছু বাকী থাকে না—থাকে কেবল আনন্দানুভূতি, রসাস্বাদন। এতত্ত্ব "অবাঙ্‌মনসোগোচরং" বাক্যমনের অতীত, "মূকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয়ং"; তাই এখানে ভগবান বুদ্ধ প্রকাশ্যে, ভগবান শঙ্কর কৌশলে, ভগবান চৈতন্য সমাধি-যোগে একেবারে নীরব।

ইহার পরে আস্তে আস্তে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অপ্রাকৃত ভগবৎলীলার স্ফুরণ আরম্ভ হয়। এই লীলা পর্য্যবসিত

হয় শারদোৎফুল্ল-মল্লিকায় পৌর্ণমাসী রাত্রিতে, পূর্ণাবতারের রসস্বরূপের রসরাজের রাসলীলায়, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ মদনমোহনের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার অভিনয়রূপ রাসলীলায় রসতত্ত্বপ্রকটনে। তোমরা কি এইভাবে শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলে? এই ব্রতের পারণার পরে আর কিন্তু সাংসারিক ভাব, সাংসারিক চিন্তা কামনা বাসনা সংস্কার আদি চিত্তে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার পরে পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে সাধকগণ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় দেহ লাভ করিয়া নিত্য বৃন্দাবন-ধামে ভগবানের নিত্যলীলার সহায় হইয়া যান। তখন তাঁহারা সর্ব্বদা বাস করেন ভগবানের আনন্দধামে, লোকে ভুল করিয়া মনে করে তাঁহারা আসিয়াছেন এই প্রাকৃত জগতে। তখন তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করেন সেবা করেন তাঁহাদের প্রাণারামের, লোকেরা না বুঝিয়া মনে করে তাঁহারা জীবের সেবা করিতেছেন! এবার শিবরাত্রির দিন রাত্রে কাশীতে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। শিবরাত্রির তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে রাত্রে কেমন যেন একটা আনন্দের নেশার ভাব অনুভব করিয়াছিলাম। যেন একটি অতি সুন্দর পূর্ণস্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার সমস্ত দেহের মধ্যে সমস্ত রাত্রি অলৌকিকরূপে শায়িত রহিয়াছিলেন। এখনও যে সে সুখের স্মৃতি আমাকে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে!

সংসারটা আছে বাহিরে—ইহা একান্তই যে বাহিরের জিনিস, ইহাকে ভিতরে যাইতে দিতে নাই ; ইহা কোনরূপে একবার ভিতরে যাইতে পারিলে যে আমাদের ভিতরকার বৃন্দাবন-ধামকে কলুষিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিবে ; ভিতরে গিয়া আমাদের সেই পরম মহারাজের রত্নসিংহাসন পর্য্যন্ত এমনভাবে দখল করিয়া বসিবে যে, সেখানে আর ভগবানের জন্য একটুও স্থান খালি থাকিবে না। যে চিত্ত কামনা বাসনা আসক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ, সে চিত্তে ভগবান আবির্ভূত হইলেও বসিবেন কোথায়? ভিতরটা তাঁহার জন্য একান্তভাবে খালি রাখিতে চেষ্টা করিও। সংসার—সাংসারিক লোকদের ব্যবহার মনটাকে এইভাবে উদাস করিয়া না দিলে আর কি রক্ষা ছিল ? জেলখানায় আনন্দলাভের সুবিধা থাকিলে কে আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিত, বলতো ? সে দেশে যাবার পিপাসাটা তৈয়ার কর, পথের সন্ধান বলে দিতে—হাত ধ'রে নিয়ে যেতে তিনি সদাই ব্যস্ত। সংসারের আসক্তি রসবোধ দূর না হইলে সে দেশের জন্য পিপাসাটা ঠিক ভাবে না পাইলে তিনি যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন না। তিনি তো দাঁড়াইয়া আছেন কিন্তু দেখে কে ? তিনি তো সর্ব্বদা ডাকিতেছেন কিন্তু সে ডাক শুনে কে ? মানুষ যে তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। অপরের মধ্যে দোষ নজরে পড়িতে আরম্ভ হয় তখন, যখন আমাদের ভিতরে

শিবরাত্রির ব্রতকথা

প্রেমের অভাব হয়। কাম দেখে নিজের ভিতরে গুণ, তাহার লক্ষ্য থাকে নিজের স্বার্থ—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা। প্রেম দেখে সর্ব্বত্র তাহার প্রেমময়ের বিকাশবিভূতি, সর্ব্বত্র ভগবৎভাবের প্রকাশ; তাই সে নিজেকে ভুলিয়া নিজের সুখস্পৃহা ভুলিয়া সকলের ভিতর দিয়া তাহার প্রিয়তমকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবায় বিভোর থাকে। প্রেমাস্পদের গুণগুলি প্রেমিককে বিভোর করিয়া রাখে। সে দোষ-ত্রুটি দেখিতে পায় কেবল নিজের ভিতরে; কারণ ও সব ময়লা যে তাহার প্রেমাস্পদকে ভাল করিয়া দেখিতে আস্বাদ করিতে সেবা করিতে বাধা দেয়। যাহা প্রেমের বিকাশের বিঘ্ন, তাহা প্রেমিক কি করিয়া সহ্য করিবে? সামান্য বিঘ্ন যে মহান্ বাধারূপে প্রতীয়মান হয়। "যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতং, শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" শ্লোকটা স্মরণ কর। এই ভাবটা না আসিলে ব্রতকথা শুনিবার অধিকার লাভ হয় না; তাই বলা হয়, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

আমাদের পুরোহিতেরা পূজারীরা সাধারণতঃ শিবরাত্রির যে ব্রতকথা বলিয়া থাকেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, একদা এক ব্যাধ মৃগয়াচ্ছলে একটী বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল, সেই বৃক্ষের ডালে বসিয়া অনেকগুলি পাখী শিকার করিল। ঘটনাক্রমে সেই গাছটি ছিল বেলগাছ, তাহার নীচে ছিল একটি পাথরের শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি, আর সেই দিনকার

তিথিটা ছিল শিবচতুর্দ্দশী। এখন, শিবচতুর্দ্দশীর দিনে ব্যাধের ব্যাধবৃত্তির ফলে বৃক্ষে নাড়া লাগিয়া তিনটি বেলপাতা ব্যাধের অজ্ঞাতসারে গাছের গোড়ায় সেই শিবলিঙ্গের উপর গিয়া পড়িল। বাকী রহিল বেলপাতায় চন্দন-মাখান ব্যাপারটা। মৃত পাখীদের রক্ত ঐ তিনটি বেলপাতায় লাগিয়া চন্দনের অভাব পূর্ণ করিয়া দিল! ব্যাধ আর তখন যায় কোথায়? অমনি শিবদূত সশরীরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত—ব্যাধকে কৈলাসে না নিয়া গেলেই যে আর চলে না! শিবের আদেশে তাহাকে স্বর্গে নিয়া গিয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ-ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।*

যে শিবকে জ্ঞানের আধার বলা হইয়াছে—"জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাৎ ইচ্ছেৎ", সেই শিবকে এমন একজন মূর্খ করিয়া তোলা হইল যে, তিনি রক্তকে চন্দন বলিয়া ভুল বুঝিয়া লইলেন! পণ্ডিতেরা বলিয়া বসিলেন, শিব আশুতোষ তাই অল্পেই তৃপ্ত—সামান্য সাধনায়ও যে-কোন বর দিতে প্রস্তুত। জয়দ্রথ বেলপাতা দিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করায়, দ্বারী শিব নাকি একদিন পাণ্ডবদের শিবিরের দ্বার বিনা বাক্যব্যয়ে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আশুতোষের এ রহস্য আমাদের ধারণার অতীত। কর্ম্মফলের এইরূপ অসদ্ব্যবহারে জগৎ অচিরে ধ্বংস পাইতে আরম্ভ করে। পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য

* শিবরাত্রির ব্রতকথার মধ্যে দেশবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় একথা মনে রাখিতে হইবে।

এখানেও হার মানিতে প্রস্তুত নহে। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন শিব যে লয়ের কর্ত্তা, জগতের লয়সাধন সর্ব্বনাশ-সাধনই যে শিবের কাজ। কামনা বাসনা আসক্তির নাশ সুতরাং জাগতিক ভাবের সংসারভাবের বিলোপসাধনই তো শিবের কাজ, এটা এক রকম বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা ছাড়া যাবতীয় সৎকর্ম্মের নাশ—সদ্ভাবের নাশ, কার্য্যকারণসম্বন্ধের নাশ করিয়া মহাপ্রলয়ে জগৎকে লয় না করিয়া তাহার পূর্ব্বেই উহাকে উচ্ছন্ন দিতে যাওয়া শিবের কাজ, একথা বলিলে যে শিবে ও অশিবে, প্রেমে ও অপ্রেমে, সাধু ও অসাধুতে আর কোনও ভেদ থাকে না। তবে এক অবস্থা আছে স্বীকার করি, যাহা সমস্ত ভেদভাবের অতীত। সে স্থানটি নাকি শিবের আসল বাসস্থান! সে স্থানটি শিবের ত্রিশূলের ত্রিগুণজনিত দুঃখকষ্টেরও অনেক উপরে গুণাতীত আনন্দধামে অবস্থিত—যাহার আভাস দিবার জন্য বলা হয় "স্বমহিম্নিইব স্থিতঃ"। এখানে গুণাতীত মানে সত্ত্বগুণের অনেক উপরে বলিয়াই আমাদের মনে হয়, তমোগুণের নীচে নয়। তাহা না হইলে যে, পাথরে ও পরমহংসে কোনও ভেদ থাকে না।

ব্যাধের কাজ শিকার করা হিংসা করা, যে কাজকে ঘোর তামসিক বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে; এই তামসিক কাজের কর্ত্তা যদি অজ্ঞাতসারে কাকতালীয় ন্যায়ে বেলপাতা পড়ার নিমিত্তকারণ মাত্র হইয়া

তাহার সমস্ত পাপ কর্ম্মফলের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া পরমানন্দলাভের পরমপদপ্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারে, তবে যে আর কর্ম্মরহস্যের কোনও মূল্যই থাকে না। হিন্দুরা যে কর্ম্মকে "নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি" বলিয়া স্তব করিয়াছেন, গীতা যে কর্ম্মকে 'ব্রহ্মোদ্ভব' বলিয়া 'যজ্ঞ' বলিয়া এত প্রশংসা করিয়াছেন, যে কর্ম্মরহস্য হিন্দুধর্ম্মের একটি সার কথা, সে কর্ম্মকে এইরূপ নির্ম্মমভাবে নাশ করিতে যাওয়া যে একটা মহা অহিন্দুর কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানেও কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া বসেন যে, ঐ ব্যাধের পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতি ছিল, যাহার ফলে তাহার ঐভাবে স্বর্গলাভ হইল। পূর্ব্বজন্মের সামান্য একটু কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাকী ছিল, যাহার ফলে তাহাকে এই ব্যাধ-জন্মলাভ করিতে হইয়াছিল। অজামিলের দৃষ্টান্তও নাকি এই ভাবের পোষক। এসব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তাহাদের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, কেন ভক্ত জীব-গোস্বামীকে পর্য্যন্ত অজামিলের নারায়ণ-স্মরণ ক্রমমুক্তির সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এই ব্রতকাহিনী কোথা হইতে আসিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সব ব্রতকথায় একটা সুন্দর মূল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সঙ্গে অনধিকারী পণ্ডিত পুরোহিতদের অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরতা মিলিত হইয়া ব্রত-

কথাটিকে একটা অসার উপকথায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যদেহকে একটা বৃক্ষরূপে বর্ণনা অনেক যায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায় যেমন "ঊর্দ্ধমূল-মধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং", উপনিষদেও এইরূপ বৃক্ষের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষটী অনেকটা স্নায়ুযন্ত্রের (nervous system) এর অনুরূপ। সহস্রারে ইহার মূল, মেরুদণ্ডে ইহার কাণ্ড, সর্ব্বশরীরে ইহার শাখাপ্রশাখা প্রসারিত। যোগশাস্ত্রে সাধনশাস্ত্রে ভক্তিশাস্ত্রে এইভাবের বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষটিকে গীতা অশ্বত্থ, শৈব বেল, বৈষ্ণব কদম্ব বা কল্পতরু ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। "মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জ্ঞানে জগন্মোহনং" স্তবটী এই ভাবের পোষক। বেলগাছের তলায় শিবের বাস সর্ব্বজন-বিদিত সত্য। এই বৃক্ষের মূলে অর্থাৎ সহস্রারে যে ভগবানের স্থিতি পূর্ণভাবে প্রকাশ, তাহা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ভাব অবলম্বনে শিবরাত্রির ব্রতকথায় বেলগাছের গোড়ায় শিবের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। তারপরে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে", "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে এই দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুই পাখী বর্ত্তমান। জীবাত্মা ব্যাধতুল্য; কারণ সে ইন্দ্রিয়রূপ তীর দ্বারা বিষয়রূপ পাখী শিকার করিয়া জীবনধারণ করে, বিষয়বৃক্ষের সুফল-কুফলরূপ পক্কফল

ভোগ করে—কর্ম্মফল দ্বারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে ; পরে যখন সে তাহার সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে শিখে, দেহবৃক্ষের ত্রিপত্র তিনগুণ ত্রিগুণজনিত কর্ম্মফল সে ভগবানে সমর্পণ করিয়া আত্মনিবেদন করিতে শিখে, তখন সে অক্ষয় স্বর্গধামে গুণাতীত অপ্রাকৃত কৈলাসধামে গিয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করিতে সক্ষম হয়। যে চাকুতে ফল কাটে, সেই চাকুই ব্যবহার-দোষে হাত কাটিতে বসে,—যে ব্রতকথা সাত্ত্বিক লোকের হাতে অতি সুন্দর ভগবৎভাব প্রকাশ করিত, তাহাই তামসিক লোকের হাতে পড়িয়া তমোগুণ দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া বিকৃত হইয়া দূষণীয় ভাব ধারণ করিয়া বসিয়াছে।

এই দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পাখী বর্ত্তমান। পরমাত্মা ইহার মূলদেশে সহস্রারে অবস্থিত। জীবাত্মা ইহার বিভিন্ন শাখায় অবস্থিত থাকিয়া বিষয়রূপ ফলভোগে নিরত। তাহার হাতে যে প্রণবরূপ ধনুটি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা দ্বারা এখন সে বিষয়রূপ ফলভেদে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। তারপরে ভগবৎকৃপায় যখন সে বিষয় ছাড়িয়া ভগবানের দিকে চোখ ফিরায়, তখন ব্রহ্মের অলৌকিক সৌন্দর্য্য-রসে আকৃষ্ট হইয়া বিষয় ছাড়িয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য ভেদ করিয়া সে তাহার জন্ম সফল করিয়া তোলে। তখন যে তাহার সমস্ত কর্ম্ম, গুণজনিত সমস্ত ব্যাপার ভগবানে অর্পিত হইয়া অক্ষয় মোক্ষফলের

কারণ হইয়া পড়ে। শিবরাত্রির ব্রতকথা জীবকে জীবের মনকে বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া শিবের দিকে নিয়োজিত করিয়া জীবের চিত্তকে বিষয়ানন্দের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিয়া রাখে।

অন্নপূর্ণা

প্রাচীন ঋষিগণ প্রকৃতি-দেবীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতি-দেবীর ভিতর দিয়া প্রকৃতির অন্তর্যামী মা ভগবতীর পূজা করিতেন, প্রকৃতির তালে তাল মিলাইয়া পরম পুরুষের দর্শন ও সেবার অধিকার লাভ করিতেন। একই ব্রহ্মতত্ত্ব যে কিভাবে ছিন্নমস্তাতত্ত্বের ন্যায় আপনাকে অনন্ততত্ত্বে অনন্তভাবে অনন্তপদার্থে বিভক্ত করিয়া আপন আনন্দে আপনি বিভোর থাকেন, জীবের সব তত্ত্বের পুষ্টি ও পরিণতির সহায় হইয়া জীবের যাবতীয় তত্ত্বে বিরাজমান থাকিয়া অপার আনন্দ ভোগ করেন, জীবকে ভগবৎলীলা-রহস্য আস্বাদ করান, ঋষিগণ তাহা বেশ সুন্দরভাবে

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকৃতি-দেবীর একএকটি কাজ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎভাবে বিভোর হইয়া যাইত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িত।

আজ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী, মাঠ হইতে জীবের জীবনরূপী শস্যসমূহ আহৃত হইয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শস্যের আগমনের মধ্য দিয়া মাতৃভক্ত সাধক মায়েরই আগমন, মায়ের পালনী শক্তি, মায়ের অপার করুণারাশি দর্শন করিয়া মাকে আনন্দময়ী দয়াময়ী বাৎসল্যময়ী বলিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন ধ্যানযোগে সাধকদের ভিতরকার সব তত্ত্ব খুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, জগন্ময়ীরও সব তত্ত্ব তাঁহারা দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। মা যে প্রতি তত্ত্বে চৈতন্যময়ী-রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতি পদার্থের ভিতর দিয়া ভোক্ত্রী ও ভোগ্যরূপে কিভাবে সকল তত্ত্বের সকল জীবের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া সাধকদের হৃদয় তখন অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত হইয়া পড়িল।

অসাধকের নিকট যাহা যত্নপ্রসূত খাদ্য, তত্ত্বদর্শী সাধকের নিকট তাহাই যে মায়ের অশেষ কৃপার নিদর্শন—সমস্ত ভোগ্য পদার্থের মধ্য দিয়াই যে মায়ের দয়া অজস্র-ভাবে বর্ষিত হইতেছে! আহারতত্ত্বকে তাঁহারা যে শুধু একটা অন্নময়-কোষে সীমাবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি বোধ করেন না, পঞ্চকোষের ভিতর দিয়া ইহার কার্য্যপ্রণালী তাঁহাদের

নয়নে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করে। পরে যখন সাধক অনুভব করিতে আরম্ভ করেন যে, মা নিজেই ত্রিপুটি-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ভোক্তা ভোগ্য ভোজনরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দ কে দেখে? আত্মারূপে তিনি নিজেই ভোক্তা, ইন্দ্রিয়রূপে তিনি ভোজনের যন্ত্র, আবার অন্নরূপে তিনিই ভোগের সামগ্রী। ধন্য মা, তোমার লীলাবিভূতি! তোমার এই সৃষ্টিরহস্য তোমার এই লীলাতত্ত্ব দেখিয়া জীব তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিয়া তোমার কাছেই অন্নভিক্ষা করিতেছে। ঘরে এমন মা বর্ত্তমান থাকিতে পরের কাছে অন্ন ভিক্ষা করা ভাবনা-চিন্তায় দীনতা-হীনতায় মলিনভাবে জীবন যাপন করা কি মাতৃভক্ত সাধকের নিকট শোভা পায়? আত্মারূপী পরমাত্মারূপী দেবাদিদেব মহাদেবও যে আজ তোমার দ্বারে ভিখারীর বেশে দণ্ডায়মান—তোমার সাহায্য ব্যতীত জগন্নাথও জগৎ সৃষ্টি করিতে অক্ষম—শিবের শিবত্ব কেহই আস্বাদ করিতে পারে না।

হে চৈতন্যরূপিণি মা অন্নপূর্ণাদেবি, তুমি শস্যাদির ভিতর দিয়া জীবের অন্নময়-কোষের তৃপ্তিসাধন কর; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্য দিয়া প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশের সহায় হইয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের ধ্যান-ধারণা-সমাধির মধ্য দিয়া জীবের আনন্দময়-কোষের সুতরাং জীবের সমস্ত কোষগুলির পরম পরিণতি চরম

তৃপ্তিবিধানের তুমি সহায় হইয়া রহিয়াছ। জগতে জ্ঞান বৈরাগ্য প্রেম আনন্দ আদি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলই যে তোমার দান। “তোমার কাজ তুমি কর মা, তবু লোকে বলে করি আমি” “অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহম্ ইতি মন্যতে”। মায়ের তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে সাধক সমাধিমগ্ন; সেই অবস্থায় তিনি মাকে যে-ভাবে দর্শন করেন অনুভব করেন, জাগ্রতাবস্থায় জীবের কল্যাণের জন্য তাহাই তিনি ভাষায় স্তবরূপে শিল্পে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। “কবি ও শিল্পী” চিঠিখানা একবার পড়িয়া দেখিও। মা যে আমার রক্তাবর্ণা ক্রিয়াত্মিকা রজোভাবাপন্না! এতগুলি সন্তানের মা যিনি, তাঁহার কি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার যো আছে? মা যে অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের যাবতীয় অভাবগুলি মোচন করিয়া আসিতেছেন, আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা বিধান করিতেছেন—“যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ”।

মার পাশের ধরাদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর তত্ত্বটা একটু ভাবিয়া দেখ। ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করিয়া তোল, উপার্জ্জিত শস্যের সৎব্যবহার দ্বারা ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখ, মা তোমার অন্নের অভাব দূর করিয়া দিবেন। মায়ের রূপ, মায়ের পূজার উপকরণ ও ধ্যানের মন্ত্রগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে জীবের যে আর কখনও অন্নের ভাবনা

ভাবিতে হয় না। মার কৃপায় সব হয়, মা-ই তো সব করেন—মা যে সন্তানের কল্যাণবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না, আমরাই তো বরং মাকে সাহায্য করিবার সুযোগ দিই না। মায়ের কৃপা আমাদের রুদ্ধ দ্বারের নিকটে চীৎকার করিয়া দুঃখের সহিত ফিরিয়া যাইতেছে। সাধক নিজের অপদার্থতা এবং ভগবানের অজস্র কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিয়া "অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে জ্ঞান-বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং মে দেহি পার্ব্বতি" বলিয়া মার অভয় চরণে প্রণত হইতে বাধ্য হয়।

মা! তুমি আদ্যাশক্তি ভগবতী, তোমার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে কিছুরই অভাব নাই! তুমি সদাপূর্ণ—তোমার কথা দূরে থাকুক, তোমার সাধক-ভক্তের সমস্ত অভাব দূর করিয়া তাহাকেও যে তুমি পূর্ণভাবে তৃপ্ত করিয়া তোল; তুমি নিজেই যে তাহার সমস্ত যোগক্ষেম বহন করিয়া থাক। শঙ্করের তুমি প্রাণবল্লভা। পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানও যে তোমারই কৃপায় তোমার অন্নে বাঁচিয়া আছেন, তোমারই কৃপায় তিনি দৃষ্ট ও অনুভূত হন, তোমারই কৃপায় তাঁহার জীব বাঁচিয়া থাকে তৃপ্তিলাভ করে শিবত্বপ্রাপ্ত হয়। তোমার দান তো শুধু অন্নময়-কোষে সীমাবদ্ধ নহে—জীবের পরম সম্পত্তি যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাও তুমি দান করিতে তৎপরা। তুমিই তো জীবের বিজ্ঞানময়-কোষকে বিকশিত করিয়া তোমার আধ্যাত্মিক অন্ন দ্বারা তাহার পুষ্টি

ও পরিণতি সাধন করিয়া তাহার স্বরূপদর্শনের "গুণ-বৈতৃষ্ণ্যং" নামক পরম বৈরাগ্যলাভের স্বরূপপ্রতিষ্ঠা-লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হও। একবার যে সাধক তোমার ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াছে, সে কি আর কখনও গুণজনিত বিষয়ানন্দের পশ্চাৎ ধাবিত হয়? তুমি তখন তাহাকে তোমার সেবানন্দ-রসে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার জীবন ধন্য করিয়া তোল।...মা যে কি ভাবে আমাদের ভিতরে অবস্থিতা, মা যে কি ভাবে আমাদের কল্যাণসাধনে তৎপরা, আমরা কি ভাবে চলিলে মার ইচ্ছা পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করিতে পারে, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা মাকে পাওয়া আর পূর্ণতা লাভ করা যে একই কথা। এস, আমরা সর্ব্বতোভাবে-উন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র মার বিভূতি দর্শন করিয়া সর্ব্বভূতে মাকে উপলব্ধি করিয়া মার সেবা করিয়া মার সন্তানগণের কল্যাণ বিধান করিয়া মার ইচ্ছা ভগবৎইচ্ছা সফল করিয়া তুলি।

চড়ক

…অনেকবার লিখিয়াছি আমাদের সমাজের মধ্যে একটা দার্শনিক বা পারমার্থিক, একটা পৌরাণিক বা মানসিক আর একটা বাহ্যিক স্থূল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে এখন কেবল আমরা একটা ঘোর তামসিক বাহ্যিক ভাবই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই। এই তামসিক ভাবটি দেখিয়া আমরা যদি ইহার ভিতরের তত্ত্বটিকে বাদ দিতে বসি, এখনও যাঁহারা এই বিষয়ে সাত্ত্বিক ভাবের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আপন আপন কল্যাণসাধনে তৎপর তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমরা যে বিশেষভাবে বঞ্চিত হইব তাহা নিঃসন্দেহ। এই চড়ক বা নীলোৎসব ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সকল দেশের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই আমরা শিবের বিবাহ-লীলার রহস্যটা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাই।

সকলেই জানেন পার্ব্বতীর তপস্যা পূর্ণ হইলে তখন দেবাদিদেব মহাদেব মদনভস্ম করিলেন, তাহার পরে কামকে প্রেমে পরিণত করিয়া এই বিবাহ সাধিত হইল। ইহা একটা যে-সে বিবাহ নহে—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে কেন

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা এই বিবাহ-তত্ত্বে সুব্যক্ত। ইহা অনুষ্ঠিত হয় বসন্তকালে—প্রকৃতি যখন ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আপন অন্তরাত্মা সেই পরম সুন্দরকে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার "আনন্দরূপমমৃতং" তত্ত্বই জগতে প্রকাশ পায়, জীব শান্ত সর্ব্বভূত-হিতে রত হইয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। সংসারে যত কিছু আনন্দ দেখ তাহাও যে সেই আনন্দেরই আংশিক বিকাশ। আনন্দ ছাড়া জীব থাকিতে পারে না, উপরের আনন্দের আস্বাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে নীচের আনন্দ লইয়া তৃপ্ত থাকে। ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলে বিষয়ানন্দ আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে—কিম্বা বিষয়ানন্দও ব্রহ্মানন্দে পর্য্যবসিত হইবে। "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" বড়কে পাইলে কে আর ছোটকে ধরিতে যায়, ছোট লইয়া ব্যস্ত থাকে! শিবের বিবাহ-তত্ত্বটি চড়ক-লীলার ভিতর দিয়া আস্বাদ করিতে পারিলে সমাজ হইতে বিবাহের তামসিক ভাবগুলি আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে। চড়কলীলা এখন তামসিকতায় পর্য্যবসিত হইল বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে না গিয়া আমাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কতটা তামসিকতা ঢুকিয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর।

প্রকৃত পূজা সহজ কথা নহে—পূজা করেন মা প্রকৃতি-দেবী। তাঁহার পূজায় যোগদান করেন তাঁহার চন্দ্রতপন,

তাঁহার সুনীল আকাশ সুগভীর সমুদ্র সুবিশাল বনস্পতি আর ফল-ফুলরাশি। দেবতাগণ সেই পূজা দর্শন করিয়া সমাধিমগ্ন। ঋষিগণ বৃন্দাবনের গোপীগণ প্রকৃতি-দেবীর তালে তাল মিলাইয়া একদিন যে পূজা করিয়া গিয়াছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই পূজার ধ্যানে হইয়া যাইতেন সমাধিমগ্ন। আমরা কেবল সেই পূজার নকল করি মাত্র; সুতরাং তামসিক পূজা দেখিয়া হাসিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আমাদের একমাত্র ভরসা এই যে আমরা সকলেই নকল পূজা করিতে করিতে একদিন আসল পূজা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিব।

...শিবরাত্রে সমাধি-যোগে শিব সাধিকার আরাধিকার সতী-দেবীর প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন, সংযম পূর্ণ হইবার ইহাই যে স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রতপারণায় পূর্ণ পরিণতিলাভে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানুভূতি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা হইল বসন্তের প্রারম্ভের কথা। মহাদেবের মদনভস্ম পার্ব্বতীর তপস্যা ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য বসন্তের প্রারম্ভেই পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন বসন্তে প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতিতে শিবের বিবাহ, ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ, ভগবতীর যাত্রা ও শিবের আরাধনার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের সমস্ত অসুর-বিনাশের পর গোপীদের কাত্যায়নীপূজা বস্ত্রহরণ ও রাস-লীলা, এসময় একবার স্মরণ করিয়া লও। শ্রীরাধার অভিসারলীলার সঙ্গে ভগবতীর যাত্রার সাদৃশ্য একবার

ধ্যানযোগে অনুভব করিয়া লও। এখন সময় হইয়াছে রাসের—মহাভাব ও রসরাজের, শক্তি ও শক্তিমানের, জীব-ব্রহ্মের, পার্ব্বতী ও মহাদেবের লীলার ভিতর দিয়া বেদান্তের অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব আস্বাদন করিবার। জগৎটা সংসারটা যে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামের গুণাতীত কৈলাস-তত্ত্বের ছায়া লীলা বা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। দেবতা না হইলে দেবতাতত্ত্ব কি করিয়া বুঝিবে, নিজের ভিতরে শিবলোক শিবলীলা আবির্ভূত না হইলে চড়কলীলা আর কি করিয়া বুঝিবে?

(যাহার চোখ খুলিয়াছে, যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়াছে, সে যে এখানে বসিয়াই সেই ভগবৎধামের নিত্যলীলা আস্বাদ করিয়া সেই আনন্দধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। যে কয়েদী জেলখানায় আবদ্ধ সেও জেইলার (Jailer) জেলখানার ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াও কিরূপ মুক্তভাবে বিচরণ করে তাহা বুঝিতে পারে। ক্রমে ক্রমে সে বুঝিতে পারে, কেন সে বদ্ধ আর জেইলার কেন মুক্ত। জেলটা একভাবে থাকিয়াও একজনের দুঃখের অপরের সুখের কারণ।

...মুক্ত পুরুষ ভগবৎঅবতার গুণের উপরে উঠিয়া গুণাতীত হইয়া উদাসীনভাবে মায়াকে বশীভূত করিয়া লীলাচ্ছলে স্বেচ্ছায় মায়ারজ্জু গ্রহণ করিয়া সংসারঅরণ্যে আনন্দের সহিত লীলা করিয়া বেড়ান। আর বদ্ধ জীব মায়ার অধীন হইয়া বিবাহবন্ধনে সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া

সংসার-চক্রে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে। যাহা মুক্তের আনন্দের সহায়, তাহাই যে আবার বদ্ধের অশেষ কষ্টের কারণ, তাহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যে পুলিশ শান্তি-স্থাপক, সে-ই যে চোর-ডাকাতের নিকট ভয়প্রদ, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সাধকরা সংসারঅবস্থায়ও শিবের সঙ্গে জীবের যোগ উপলব্ধি করিয়া শিব-পার্ব্বতীকে লইয়া তাঁহাদেরই আদেশে তাঁহাদেরই প্রীতির জন্য সংসারলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন; আর অসাধক ভগবানের সঙ্গে তাহার যোগটা ভুলিয়া গিয়া অহংকারবিমূঢ় হইয়া মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া সংসারগারদে কলুর চোখঢাকা বলদের মত ভ্রাম্যমাণ হইয়া কষ্টভোগ করে।

সাধনবর্ষের শেষে সিদ্ধবর্ষের প্রারম্ভেই এই চড়কলীলা সংসারলীলা প্রকৃতভাবে অভিনীত হইয়া থাকে। ভগবতীর যাত্রা ও শিবের পূজা দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ, জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রকৃত সম্বন্ধটা স্মরণ করাইয়া দিয়া জীবকে সেই আনন্দধামের কথা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভগবৎধামের জন্য একটা আকর্ষণ একটা প্রাণের পিপাসা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করা হয়। "তত্র লৌল্যমপি তন্মূল্যং কেনচিৎ সুকৃতেনাপি লভ্যতে" ভগবানের উপর একটা লোভ একটা প্রাণের টানই যে সাধকেরা প্রধান রহস্য বলিয়া মনে করেন। জীব একবার তাহার স্বরূপ ভগবৎস্বরূপ ও উভয়ের সম্বন্ধটী টের পাইলে,

তাহার সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের রসলীলার আস্বাদ পাইলে তখন তাহার প্রাণারামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সেই যোগ স্মরণ রাখিয়া এই সংসারেই অসংসারীর ন্যায় জীবন্মুক্তের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিবার আনন্দ আস্বাদ করিয়া আনন্দ দান করিবার অধিকার লাভ করে।) প্রাচীনকালে বারমাসে তের পার্ব্বণ শুধু জীবকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার আনন্দধামের উপযুক্ত অধিকারী করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইত। জীবের কর্ম্মদোষে কালের দুর্জ্জয়প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমায় সে সব অনুষ্ঠান এখন কেবল একটা তামসিক বাহ্য আচরণবিশেষে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" অশ্বত্থ বৃক্ষটি দেহের মধ্যে জগতের মধ্যে কিভাবে বর্ত্তমান তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" কথাটা স্মরণ কর। সহস্রার সঙ্গে স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শিবের সঙ্গে জীবের জগতের বন্ধনটা ভাবিয়া দেখ। শিবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যুক্ত থাকিয়া কিভাবে জগতে সংসারচক্রে বিচরণ করিতে হয়—শিবকে ভুলিয়া জীবের আপন স্বরূপ ভুলিয়া আজকাল কিভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করি, তাহাও ভাবিয়া দেখ,—সেকালের ও একালের চড়কগাছের অভিনয় বুঝিতে পারিবে। বৃন্দা-বনের লাভ্যার মেলা মনে আছে ত? কোথায় মূলাধার হইতে সহস্রারে গিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অতুল আনন্দের অপার শান্তির উত্তরাধিকারী হওয়া, আর কোথায় সামান্য

একটা পিচ্ছিল কাষ্ঠদণ্ডের উপরে চড়িয়া বিশ-পঁচিশটা রৌপ্যমুদ্রা ও তুইএকটি পিত্তলের কলসী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করা ও লোকের প্রশংসাভাজন হওয়া! একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রায় সকল তামসিক অনুষ্ঠানগুলিরই পিছনে এক-একটা আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্ব দেখিতে পাইবে। আমরা যেমন শুধু নামে আর্য্য, কাজে অনার্য্য; অনুষ্ঠানগুলিও তদ্রূপ নামে সাধনা, কাজে ঘোর তামসিকতায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।......

আমাদের সভ্য (?) সমাজ দেশী আচারব্যবহার ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান ছাড়িয়া বিদেশী সভ্যতার কুহকে ভুলিয়া বিনাশের পথে পতনের রাস্তায় কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সহজে বোঝা কঠিন। আর্য্যসভ্যতার কিছুমাত্র যদি আমাদের ভিতর বর্ত্তমান থাকিত, তবে একালের ও সেকালের পার্থক্যটা আমরা একটু সহজেই অনুমান করিতে পারিতাম। আমাদের তুরবস্থাকেও যে আমরা তুরবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি না, ইহাই আমাদের ভিতর-বাহিরের বিকৃতি প্রকাশ করিয়া দেয়। মেথর পায়খানার তুর্গন্ধ টের পায় না বলিয়া কোনও ভদ্রলোক বলিতে প্রস্তুত হইবে না যে, পায়খানায় তুর্গন্ধ নাই।

যাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারা কতক পরিমাণে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা এপর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছে। পাহাড়ীদের সরলতা নির্ভীকতা দয়া ও প্রেমাদি

ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী। কোল ভীল আদির মধ্যেও কতকটা বিকৃতভাবে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। চণ্ডালেরা চণ্ডাল বলিয়া সভ্যসমাজে ঘৃণিত হইলেও তাহারা প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার যতটুকু পাইয়াছিল, পাশ্চাত্যে সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্যের মোহে মোহিত হইয়া নিজেদের সেই প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য্যটুকু হারাইয়া অস্বাভাবিকভাবে বানর সাজিয়া স্বদেশে কথায় ভাবে ও কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী হইয়া একেবারে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া যায় নাই।

সময় সময় সভ্যসমাজে মহাত্মাবিশেষের উপদেশানুসারে চলিতে গিয়াও আমরা যে কিভাবে অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। খদ্দরের কাপড়ের গলাকাটা জামাগুলো একথার কতকটা সাক্ষী। আমরা সব হারাইয়াছি বা হারাইতে বসিয়াছি, তাই নিম্নশ্রেণী মধ্যে যেটুকু স্বাভাবিক সরল ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই, তাহাতেই মোহিত হইয়া যাই। পুরুলিয়ায় মেথরদের কীর্ত্তনে আমাকে যে আনন্দ দিয়াছিল, তোমাদের বৃন্দাবনে গোঁসাইদের বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া সে আনন্দ খুঁজিয়া পাই নাই। বৃন্দাবনে একজন চামারের ভিতরে যেরূপ ভগবৎভাবের বিকাশ দেখিয়াছিলাম, সমস্ত বৃন্দাবন খুঁজিয়া কোন বাবাজি-মোহান্তর ভিতরে সে আনন্দ আস্বাদন করিতে পারি নাই। এক হাজার গরীব কৃষককে সুপথে আনা যত সহজ, একজন

নব্যশিক্ষিত যুবককে সুপথে আনা যে তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন, তাহা না বলিলে বোধ হয় মিথ্যা কথা বলা হয়। আমাদের গরীবদের ভিতরে ভগবৎভাব চাপা রহিয়াছে—সভ্যসমাজে ভগবদ্ভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে।............

দক্ষ সর্ব্বকার্য্যক্ষম হইয়া যখন ভগবৎবিধানে ভগবৎ আজ্ঞাপালনে তৎপর থাকে, তখন সতী বিশুদ্ধ-বুদ্ধি তাহার কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়, নিজের ভিতর হইতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়; সেই বুদ্ধি দ্বারা মঙ্গলময় শিবকে পরমাত্মীয়রূপে পাইয়া পরমাত্মীয় জানিয়া তাঁহার সেবায় জগতের কল্যাণে জীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। সেই দক্ষই আবার যখন ভগবানকে ভুলিয়া ভগবানকে বাদ দিয়া অহং-মদে মত্ত হইয়া নিজের স্বার্থের জন্য শিবহীন মঙ্গলহীন ভোগ-স্পৃহামূলক কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়, তখন আস্তে আস্তে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইতে বসে, সতী দেহত্যাগ করেন—ভগবৎ-বিধানে সে ক্রমশঃ পশুত্বে পরিণত হয়। কামনাবাসনা-তাড়িত ব্যক্তির ছাগমুণ্ডই সাধারণতঃ মস্তকের শোভা—বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক হইয়া থাকে। এইরূপ দক্ষের অত্যাচারে তাড়িত হইয়া সাধুসজ্জনের বনে গমন, গিরি-গহ্বরে বাস, ভারতে নূতন কথা নহে। ধর্ম্ম তখন জনসমাজে স্থান না পাইয়া বনে-অরণ্যে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লাভ করে। হিমালয় তখন ধর্ম্মকে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সেই সতীর উমার জন্মদাতা পালনকর্ত্তারূপে

পরিগণিত হয়। তখন সেই উমা প্রাচীন সনাতন শিবের মঙ্গলময়ের সহিত পরিণীতা হইয়া আদর্শ নারীরূপে সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে সাধক ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। সভ্যসমাজ শিক্ষিতসমাজ এই সব আনন্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকেন। তাই চণ্ডাল কোল ভীল আদি তথাকথিত অসভ্যজাতি শিব-পার্ব্বতীর পরিণতি পরিণয় বিবাহ, জগতের কল্যাণসাধনের লীলারহস্য আস্বাদ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া তোলে। বাস্তবিকই "ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতং গুহায়াম্"।

চড়কউৎসবে আমরা দেখিতে পাইলাম ব্রহ্মচর্য্যব্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তারপরে সংসারআশ্রমে প্রবেশ করিয়া রাজর্ষি জনকের ন্যায় কিভাবে অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগীর মত মুক্তভাবে বিচরণ করিতে পারা যায়। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইলেন একটা আদর্শ গৃহীর দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য। চড়কের অনুষ্ঠানগুলি দেওয়া হয় সন্ন্যাসীদের হাতে। প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারে কিরূপ মুক্তভাবে বিচরণ করেন, তাহা দেখানই ছিল চড়কের উদ্দেশ্য। ইঁহারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও সুষুম্নার সাহায্যে সহস্রারস্থ সদাশিবের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ থাকিয়াও মুক্তভাবে বিচরণ করেন। শিবের সঙ্গে যোগ থাকিলে মায়া আর কি করিয়া তাহাকে বিচলিত করিবে? সন্ন্যাস-

আশ্রম এখন কিভাবে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সন্ন্যাসীগণ আজকাল কিভাবে ভোগবিলাসে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিনে কাল্পনিক সন্ন্যাসীদের অবস্থা কার্য্যপ্রণালী সমাধিলাভ ইত্যাদি দেখিলেই তাহার বেশ সুন্দর একটা আভাস পাওয়া যায়।

মঙ্গলময় শিব কেন যে শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-গণকে পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্য-শূদ্রাদি সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, দক্ষযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শিবের গৃহিণী মা অন্নপূর্ণা দীনদুঃখী সন্তানগণকে অন্নদান করিতে সদাই ব্যস্ত। জ্ঞানাধার সিদ্ধিদাতা গণপতি গণদিগকে সাধারণ জীবকে লইয়া কল্যাণসাধনে তৎপর। এইজন্যই বোধ হয় আজও চড়কাদি অনুষ্ঠান চণ্ডালাদি নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

(চড়ক বসন্তকালের আনন্দোৎসব। ইহার তত্ত্ব অবগত হইয়া জীব সংসারের ভিতরে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া আনন্দরস আস্বাদন করিবার সুযোগ পায়। চড়কের সাধক সহস্রারে সদাশিবের সঙ্গে সুষুম্নামার্গ দ্বারা যুক্ত থাকিয়া সংসারঅরণ্যে বিচরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করেন। চড়কের গাছটি মেরুদণ্ডের প্রতীক—তাহাতে ভ্রমণাদি ক্রিয়ার সঙ্গে প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

গঙ্গাপূজা

গঙ্গাশব্দের অর্থ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে "গময়তি প্রাপয়তি আত্মানং পরমাত্মানং যা সা গঙ্গা"। যাহা আত্মাকে পরমাত্মাকে পাইতে সাহায্য করে অর্থাৎ যাহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় তাহারই নাম গঙ্গা। জ্ঞানাবতার শঙ্করও তাই বোধ হয় বলিয়া গিয়াছেন "ত্রিভু নজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা"—সর্ব্বব্যাপী ভগবৎচিদ্বিভূতিই গঙ্গা। যোগশাস্ত্রমতে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সুষুম্নাই গঙ্গা নামে অভিহিত। ঋষিদের মতে পারমার্থিক-ভাবে গঙ্গা ব্রহ্মজ্ঞান, গঙ্গা ভগবৎভাব, গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জলবিশিষ্ট নদীবিশেষ। শরীরকে পবিত্র জল দ্বারা শুদ্ধ করা, চিত্তকে পবিত্র ভাব দ্বারা সুশোভিত করা, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ভগবানের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যানুভূতি লাভ করার নামই গঙ্গাস্নান। এই শারীরিক মানসিক ও পারমার্থিক ভাবত্রয়ের পরিণতি ও সামঞ্জস্যের উপর গঙ্গাস্নানের ফল নির্ভর করে। এই ত্রিবিধ ভাবের স্নান দ্বারা দেহশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। বলা বাহুল্য, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া অর্থব্যয় করিয়া হরিদ্বার আদি তীর্থে বিশেষতঃ উৎসবের সময়ে গমন করেন, অতিরিক্ত

ভিঁড়ের জন্য তাঁহাদের গঙ্গাস্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হওয়া সন্দেহজনক ব্যাপার। ভগীরথের গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নপ্রবাদের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ কাটা খালের রহস্য, সাধকগণ সহস্রার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-স্রোতের গতাগতির প্রণালীস্বরূপ প্রাণায়াম-তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ পান। গঙ্গার পূজা জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী তিথিতে—রজোগুণের পরিণতাবস্থায় সাত্ত্বিকভাবের আগমনে, গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যের পরে জলের যখন বিশেষ দরকার তখন। গঙ্গার শুভ্রবর্ণ সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিকভাবের দ্যোতক, তাঁহার চারি বাহু সাধককে চতুর্ব্বর্গ ফলদানে তৎপর। গঙ্গার বাহন মকর—পঞ্চ মকার তত্ত্বের মধ্যে মৎস্যতত্ত্বের প্রতীক, সুষুম্নাবর্ত্মে বিচরণশীল হংস বা অজপা-তত্ত্ব। মায়ের পূজার ফল সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তি ও কৈবল্য-প্রাপ্তি।

রথযাত্রা

রথ শব্দের প্রকৃত অর্থ বাহন—যে বহন করিয়া আনে, যাহার উপর আরোহণ করিয়া কেহ যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। আমাদের এই দেহরূপ রথের জগৎরূপ রথের কে বাহক কে চালক আর কি করিয়াই বা তাঁহাকে দর্শন ও উপলব্ধি করা যায়, তাহা লইয়াই আমাদের এই রথোৎসব। এই রথ ও তাহার চালক বিষ্ণুমূর্ত্তিকে প্রতীকভাবে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেহের ও জগতের চালককে জানিয়া লওয়াই এই উৎসবের লক্ষ্য। প্রায় সকল তীর্থে ও প্রধান প্রধান সহরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও পুরীধামের উৎসবটিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সাধকগণ এই পুরীধামকে দেহপুরীর উপযুক্ত প্রতীক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উৎসবটি সম্পাদিত হয় আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে। গ্রীষ্মের তীব্রতাপে সাধনার তীব্র সংযমে চিত্ত অন্তর্মুখী হইয়াছে; এই সময় দেহের সমস্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া দেহের ভিতরে বামনদেবকে সীমাবদ্ধ জীবরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে মনাতীত পরব্রহ্মকে প্রকৃত চালকরূপে সারথিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। উপনিষদের "আত্মানং

রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ” শ্লোকটি স্মরণ কর। “ইন্দ্রিয়াণি হয়ন্যাহুঃ” দেহস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে কেন এই রথের অশ্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; তখন বুঝিতে পারিবে, কেন এই রথলীলা পুরীধামে ব্যষ্টিভাবে দেহপুরীতে সাধকদেহে, সমষ্টিভাবে সমস্ত জগদ্দেহে জগন্নাথক্ষেত্রে ভেদাতীত আনন্দময়প্রদেশে বিশেষভাবে দর্শনীয়। পুরী যাইতে হইলে বৈতরণী পার হইয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়া বিরজা হোম করিয়া অপ্রাকৃত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে হয়।

জগতের নাথ ব্যষ্টি জীবদেহের সমষ্টি জগৎব্রহ্মাণ্ডের কোন্ তত্ত্বে কি ভাবে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার জন্য সাধনরাজ্যে সুন্দর একটা কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। সাতটি দ্বার সাতটি চক্র সাতটি তত্ত্ব জ্ঞানের সপ্তধা ভূমি বেশ সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়া সমস্ত সাধনতত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সাতটি দরজা পার হইয়া পুরীধামে জগন্নাথের মন্দিরে বামনদেবের সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। জগন্নাথদেবের স্থানটি মায়াসাগরের সংসারসমুদ্রের পরপারে অপ্রাকৃত প্রদেশে অবস্থিত; কিন্তু সে স্থানটি বর্ণনার অতীত, জীব যে মায়াতীত তত্ত্ব ধারণায়ও আনিতে পারে না; তাই জগন্নাথদেবকে মায়াসমুদ্রের এপারেই অবস্থিত দেখিয়া প্রতি তত্ত্বে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া সাধক লীলারস আস্বাদ করিতে ভাল বাসেন।

জগন্নাথের ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘমূর্ত্তির এবং বাইবেলের ত্রিতত্ত্বের স্মারক হইলেও আমাদের মতে সংবিভূতি সুভদ্রাদেবীর, চিৎবিভূতি জগন্নাথদেবের এবং আনন্দবিভূতি বলরামের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দকে বেশ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, বাক্য-মনের অগোচর তত্ত্বকে বাক্য-মনের—এমন কি, শিল্পকলার ভিতব দিয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে গিয়া জীব ভগবৎতত্ত্বকে যে কিভাবে বিকৃত করিয়া তোলে, তাহা জগন্নাথদেবের অপরিণত রূপটির মধ্য দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। জীব শ্রীভগবানের দেহ, জীবাত্মাটি ভিতরকার দেহ আর স্থূল দেহ ও মন ইহাঁর বাহিরের দেহ। ভিতরের দেহটি অজর অমর নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ, আর বাহিরের দেহটি জরা-মরণশীল পূতিগন্ধের আধার কামনা বাসনা আসক্তির জ্বালায় অস্থির। বাহিরের এই বিকৃত পরিণতির ভিতরে কি সুন্দর সাত্ত্বিক ভাব, বাহিরের এত অপবিত্রতার ভিতরে রহিয়াছে কি সুন্দর চরম পবিত্র তত্ত্ব, বাহিরের যাবতীয় দুঃখকষ্টের ভিতরে কি সুন্দর আনন্দময় আত্মরাজ্য অবস্থিত, ভিতর-বাহিরের সাধকঅসাধকের ভিতরকার একটা স্পষ্ট পার্থক্যভাব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্য নাকি মন্দিরের ভিতর-বাহিরের দৃশ্যগুলির এমন একটা পার্থক্য দেখান হইয়াছে। বহির্দৃষ্টির কি ভীষণ বীভৎস পরিণতি

আর অন্তর্দৃষ্টির কি সুন্দর পবিত্র ভাব, ইহা যেন একাধারে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। রশি দিয়া জগন্নাথদেবের রথ টানা হয়; এই রশিগুলি যে জীবের স্নায়ুমণ্ডলী, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের বিষয়-গ্রহণব্যাপারের মধ্যে আমাদের মনকে আমাদের জীবাত্মাকে কি ভাবে স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া আমাদের মন প্রভৃতিকে বিষয়াকারে আকারিত করা হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আত্মা মন কিভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, বিষয় গ্রহণ করে—দেহ-রথখানিকে বিষয়ের দিকে প্রধাবিত করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বরূপেই বর্ণনা করিতে হয়।

রথের অনুষ্ঠানটি, সাধন-ভজনগুলি দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করে কি ভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া দেহের ভিতরে দেহীকে, জগতের ভিতরে জগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিতে হয়। রথস্থ বামনকে দেখিতে পাইলে শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। দেহে দেহীকে জগতে জগন্নাথদেবকে আধারে আধেয়কে সর্পে রজ্জুকে সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টাকে দেখিতে পাইলে সেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ব্রহ্মানুভূতির পরে সাধকেব যে আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তখন সাধক যে নির্ব্বাণমুক্তির ভিতর দিয়া পরম কৈবল্য অবস্থা লাভ করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তেত্রিশ-কোটি

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ-কোটি কেন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দুইটি শব্দ লইয়া বিচার করিতে হইবে—একটি দেবতা কি জিনিস এবং অপরটি তেত্রিশ-কোটি শব্দের অর্থ কি। দেবতা শব্দের অর্থসম্বন্ধে বহুবার বহু কথা লেখা হইয়াছে বলিয়া এবার আর বেশী কিছু লিখিব না, শুধু এইটুকু মাত্র মনে রাখিলেই চলিবে যে, দেবতা শব্দ দিব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া, ক্রীড়া করা।

সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে পরিণতা হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি স্তরে প্রতি পরিণতিতে পুরুষ-চৈতন্য বিভিন্নভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, লীলা করিতেছেন। চৈতন্য এক হইলেও আধার-তারতম্যে জলচন্দ্রবৎ তাঁহার বিকাশের ভেদ পরিকল্পিত হয়। প্রকৃতি যত ভাগে বিভক্তা, পুরুষচৈতন্য দেবতা-তত্ত্বও তত ভাগে বিভিন্নরূপে অনুমিত ও বর্ণিত হইয়া থাকেন। সুতরাং জগতে যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত প্রকাশমান লীলারত দেবতা-তত্ত্বও তত ভাগে বিভক্ত। যে ঋষি প্রকৃতিকে যত ভাগে বিভক্তরূপে অনুভব করিয়াছেন, তিনি দেবতা-

সংখ্যাও তত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদে প্রধান দেবতা তিন, তারপরে একাদশ, তৎপরে তেত্রিশ—ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য মিত্র বরুণ সোম বৃহস্পতি পূষা অর্য্যমা আদি সব বৈদিক দেবতা। দর্শন ও যোগশাস্ত্রে প্রকৃতির আটটি প্রধান স্তরে কুবের বরুণ অগ্নি পবন যম ও চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেবতার অধিষ্ঠান। কোন্ পদার্থে ভগবৎচৈতন্য ভগবানের সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ কি ভাবে অনুভূত হয়, দেবতা-তত্ত্ব হইতে আমরা তাহা অবগত হইতে পারি।

সংখ্যাবিষয়ে তেত্রিশ-কোটি শব্দ অনন্তভাবের বাচক, তেত্রিশ-কোটির অর্থ অনন্ত। প্রকৃতির বিচিত্রতা যেমন অনন্ত, তদধিষ্ঠিত দেবতার সংখ্যাও তেমনি অনন্ত। ঋষিগণ স্থলবিশেষে প্রকৃতির স্তরগুলিকে তেত্রিশ-সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক স্তরের ভিতরে আবার কোটি কোটি ভেদ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য বাহ্যিক পদার্থের দিকে নয়, তাঁহারা অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন ভিতরকার চৈতন্য-পদার্থটিকে। মূল চৈতন্য এক থাকিয়াও আধারের বিচিত্রতা-হেতু কি ভাবে উহা অনন্তরূপে প্রকাশ পায়, তাহা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন। একে বহু আবার বহুতে এক যে কি অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব, তাহার অনুভূতি লইয়া তাঁহারা থাকিতেন সমাধিমগ্ন। যে কারণেই হউক, এক যখন স্বেচ্ছায় বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেন, তখন তাঁহার সেই বহুত্বও যে আমাদের আদরের জিনিস; তবে তাহার মধ্য দিয়া

আমরা যেন মূল একত্বকে অনুভব করিতে ভুলিয়া না যাই। প্রকৃত দ্রষ্টা গাছের পাতা ফুলফলের মধ্য দিয়া বিচিত্র রূপ লইয়া বিভোর থাকিলেও গাছের গোড়ার একত্বের কথা তিনি ভুলিয়া যান না। গোড়ায় কারণে এক, ডালপালায় ফল-ফুলে কার্য্যরূপে বিকাশের ভিতরে তিনিই আবার অনন্ত। মূলও ঠিক, ডালপালাও ঠিক; সুতরাং ব্রহ্মের "একমেবা-দ্বিতীয়ং" ভাবটিও যেমন ঠিক, দেবতারূপে তাঁহার বহুভাবে প্রকাশ এবং লীলাভাবও তেমনি ঠিক।

······তেত্রিশ-কোটি দেবতাসম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে অনেক লেখা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিবে। একই তুমি কি ভাবে স্ত্রীর কাছে স্বামীরূপে, ভাইবোনের কাছে ভাইরূপে, মা-বাপের কাছে ছেলেরূপে, বন্ধুর কাছে বন্ধুরূপে প্রতিভাত হও, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিও। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এটা যাঁহার প্রতিজ্ঞা, তাঁহার কি নানা অধিকারীর নিকট নানারূপে নানাভাবে প্রতীয়মান না হইলে চলে? বিশ্বরূপের ভিতরে সব রূপেই যিনি বর্ত্তমান—যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহাকে যে যেরূপে ডাকিবে, তাহার কাছে তাঁহার সেইরূপে যাওয়াই যে কতকটা সমীচীন। সৃষ্টির বাহিরে তিনি অরূপ এক, সৃষ্টির ভিতরে তিনি সরূপ অনন্ত। "একোঽহং বহুধা ভবামি" এটা তো তাঁহারই কথা বলিয়া পরিচিত। সৃষ্টিঅবস্থায় যখন তিনি জগৎ সৃষ্টি

করিয়া তাহার ভিতর অনুপ্রবেশ করিলেন, তখন সৃষ্ট পদার্থের বৈচিত্র্যের জন্য গুণতারতম্যানুসারে তাঁহার প্রকাশভেদ সুতরাং অনুভূতির ভেদ হওয়াই যে স্বাভাবিক। হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টির অতীত অবস্থায় স্বরূপে যিনি এক, সৃষ্টিকালে প্রকাশে বিকাশে লীলাচ্ছলে বিকাশতারতম্যে তিনিই আবার তত কোটিরূপে অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।.........

বাহন-তত্ত্ব

জগতে সাধারণতঃ দুইটি জিনিস আমাদের নজরে পড়ে, একটি আত্মা আর একটি দেহ। আত্মাটি যেন ভিতরে লুকাইয়া থাকিয়া দেহঅবলম্বনে আপন শক্তি আপন মহিমা দেহের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া বাহির করে। আত্মা যন্ত্রী, দেহ তাহার যন্ত্র; আত্মা জীব, দেহ তাহার পোষাক; আত্মা অজর অমর—নিত্য শাশ্বত-তত্ত্ব, দেহটি পরিবর্ত্তনশীল বিকারযুক্ত। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণার অতীত, বর্ণনার অতীত। তাহার প্রকাশ বিকাশ লীলা অর্থাৎ দেবতাতত্ত্ব-অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব কতকটা প্রকাশ করা যাইতে পারে, অনুভব করা সম্ভবপর হয়। দেবতা শব্দের অর্থ আত্মার পরমাত্মার পুরুষচৈতন্যের প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন

স্তরের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লীলাখেলা। মূল প্রকৃতি যেমন তাহার সাম্যাবস্থা হারাইয়া তরঙ্গাকারে বিবিধ পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করিল, পুরুষপ্রতিবিম্বও তেমনি প্রকৃতির সেই বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হইয়া বিভিন্নরূপে লীলা করিতে আরম্ভ করিল। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা এই প্রকৃতিপুরুষের যুগল-মূর্ত্তি।

যে মূর্ত্তির ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, অর্থাৎ যে মূর্ত্তি যে তত্ত্বকে বহন করিয়া আনে প্রকাশ করে, সেই মূর্ত্তি সেই তত্ত্বের সেই দেবতার বাহন ; আর যে তত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহার নাম, সেই বাহনের অধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতা। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে ভূত (matter) বাহন, আর শক্তি (motion) দেবতা ; সাংখ্যের ভাষায় পুরুষ বা পুরুষপ্রতিবিম্ব দেবতা, আর প্রকৃতি—প্রকৃতির বিকৃতি তাহার বাহন। বেদান্তের ভাষায় আত্মা আত্মার প্রতিবিম্ব দেবতা, ত্রিবিধ-দেহ বিশেষতঃ স্থূলদেহ তাহার বাহন। জগন্নাথ দেবতা, জগৎ-দেহরথ তাঁহার বাহন। বিদ্যুৎ আলো উষ্ণতা আদি দেবতার প্রকাশের জন্য গতির জন্য যে ইথার আদি বাহনের অন্ততঃ কল্পনা একান্ত আবশ্যক, বিজ্ঞান তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন ঘোষণা করেন। বাহন শব্দের অর্থ—যে বহন করে, যে আধাররূপে দণ্ডায়মান হইয়া আধেয়কে প্রকাশ করে। যাহার উপর দাঁড়াইয়া যে শক্তি যে দেবতা আপন শক্তিবিকাশে আপন মাহাত্ম্য-

স্থাপনে উদ্দেশ্যপূরণে সমর্থ হয়, সেই আধারকেই সেই শক্তির বাহন বলা হইয়া থাকে।

সাধক ভক্ত দেবতার বাহন, তাঁহার ইষ্টের মূর্ত্তি; সাধকের ভিতর দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা ফুটিয়া বাহির হন। সাধক আপন ইষ্টতত্ত্বরূপী দেবতাকে বহন করেন, আপনার ভিতর দিয়া প্রকট করিয়া তোলেন; সাধককে দেখিয়া তাঁহার কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার প্রাণের দেবতাকে অনুভব করিবার দর্শন করিবার সুযোগ পাই। প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবতার জীয়ন্ত বিগ্রহ। তিনি তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে স্বর্গ হইতে সহস্রার হইতে মর্ত্তে আনিয়া স্থূলে, স্থূল-জগতে প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া দেন। ভক্ত হনুমান তাঁহার ইষ্ট রামচন্দ্রের প্রতীক, ভক্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণু-ভগবানের জীয়ন্ত মূর্ত্তি। সাধক একলব্য যেমন তাঁহার নিজের ভিতরে দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া আবির্ভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রকৃত সাধক-ভক্তও তেমনি তাঁহাদের আপন আপন ইষ্টদেবতাকে নিজের ভিতরে ফুটাইয়া বাহির করিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই সেই দেবতা সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। সাধক বাহন, তাঁহার ইষ্ট তাঁহার দেবতা। দেবতা প্রকাশ পাইতে লীলা করিতে ভালবাসেন, উপযুক্ত বাহন পাইলেই প্রকাশ পান।

আমরা উপযুক্ত বাহন হইলে দেবতার আবির্ভাব, পরমাত্মার প্রকাশ কিছুই কঠিন নহে। আধার যত শুদ্ধ ও পবিত্র হইবে, দেবতার প্রকাশও তত সুন্দর হইবে। The clearer the medium the greater will be the manifestation. ভগবান যীশু কিভাবে তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে, চৈতন্যদেব যেভাবে তাঁহার প্রাণের কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন।……

হিন্দু-দেবতাদের বাহনগুলি প্রায়ই পশুপক্ষীজাতীয়। মানুষ পশুপক্ষী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যদেহ লাভ করিলেও ইহাদের অনেকের ভিতরে এখনও যে অনেকখানি পশুভাব বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক জায়গায় মনুষ্যদেহধারী পশু (beast in human shape) দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগকে সেই সব পশুভাব হইতে আস্তে আস্তে মনুষ্যভাব দেবভাব আমাদের ভিতর হইতে ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে,—সেই চেষ্টাই যে সাধনা। মানুষ যেন পশুত্ব ও দেবত্বের মিলিত-মূর্ত্তি (animality and rationality combined)। পশুত্ব হইতে পূর্ণদেবত্বে পরিণত হওয়া, পূর্ণ-দেবতারূপে প্রকাশ পাওয়াই যে মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। আমাদের অনেকের ভিতরে পশুভাব লুক্কায়িত আছে—আমরা কেবল লজ্জার খাতিরে প্রতিষ্ঠার লোভে কতকগুলি দেবভাবের ভাণ করিয়া দেবতার সাধন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে চাই; কিন্তু সাধনরাজ্যে এইজাতীয় কপটতা

মহা অনিষ্টের কারণ। ভিতরের সব দোষগুলি দূর করিয়া চিত্তশুদ্ধি করাই যখন সাধনের প্রধান কাজ, তখন যাহাতে কোথাও কোনরূপ ময়লা লুকাইয়া থাকিতে না পারে, তাহার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

জীবকে রওয়ানা হইতে হইবে পশুত্ব হইতে—পশু পরিণত হইবে মানুষে, মানুষ পরিণত হইবে দেবতায়। পশু শব্দের অর্থটা চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা অনেকে যে পশুভাবাপন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না; কারণ "পাশবদ্ধো ভবেৎ পশুঃ"। পাশ বন্ধনরজ্জু, পাশ কামনা-বাসনা-আসক্তি। মানুষ যতদিন এই পাশে আবদ্ধ, ততদিন সে যে পশু। তান্ত্রিকদের পশ্বাচার-শব্দটী চিন্তনীয়। ঘৃণা লজ্জা ভয় আদি অষ্টবিধ পাশের কথা অনেকেই জানেন। এই পাশ হইতে মুক্তি দেয় জ্ঞান—তাই জ্ঞানহীন জীব পশুতুল্য "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"।......

দেবতাতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতা ভগবৎশক্তি ভগবৎপ্রতিবিম্ব। পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক হইয়াও প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলচন্দ্রবৎ বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ আবির্ভাব লীলা, ইহা লইয়াই তো দেবতাতত্ত্ব। শক্তির প্রকাশেরও অন্ত নাই, দেবতারও অন্ত নাই; তাই দেবতা

বহু বা অনন্ত। জীবও আপন আপন অধিকার অনুসারে অনন্তভাবে বিভক্ত। কোন্ জীবের ভিতর দিয়া ভগবানের কোন্ শক্তি কোন্ ভাব কিভাবে কত পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত, কি উপায়ে সেই প্রকাশ পূর্ণতালাভে সমর্থ হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া কোন্ মানুষ কোন্ দেবতার পূজা করিবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কোন্ দেবতা কাহার ইষ্ট অভীপ্সিত আরাধ্য, তাহার মধ্যেও আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লুক্কায়িত দেখিতে পাই। বটের বীজে বটগাছ হওয়াই স্বাভাবিক—তাই বটের বীজকে বটের অনুকূল জমিতে পুতিয়া তাহাতে বটের অনুকূল সার দিয়া তাহাকে আদর্শ বটবৃক্ষে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। কোন্ দেবতার কিরূপ বাহন তাহার বিচার করিতে গিয়া আমরা কোন্ সাধকের পক্ষে কিরূপ ইষ্ট দেবতা, কিরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বনীয়, তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। এইবার দেবতাদের পৃথক পৃথক স্বরূপ, তাঁহাদের পূজাপ্রণালী ও বাহনতত্ত্ব বিশেষভাবে চিন্তনীয়। কোন্ জীব কি চায়, কে কোন্ কাজে আরাম বোধ করে, কোন্ কাজ কাহার উন্নতির পরিণতির অনুকূল, কে কি কাজ করিবার জন্য জগতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ভালরূপে বিচার কবিয়া তাহার পরে সে কোন্ দেবতার বাহন হইবার উপযুক্ত, সাধক হইবার দেবতাপ্রকাশের পাত্র হইবার উপযুক্ত, তাহা ঠিক করিতে হইবে।

মা কালী শববাহনা। যে সাধক মা আগ্যাশক্তি মহাকালীর সাধনা করিতে চায়, তাহার পক্ষে নিজের ত্রিবিধ দেহকে শবে পরিণত করিতে হইবে—ত্রিবিধ-দেহে আমিত্বের অহংভাবের অধ্যাস একেবারে দূর করিয়া পূর্ণভাবে দ্বন্দ্বাতীত উদাসীন অবস্থা লাভ করিতে হইবে। তাহাকে বাঁচিয়া থাকিয়াও একেবারে যেন মরিয়া যাইতে হইবে। আত্মা শবে শিবে স্বরূপে পরিণত না হইলে তাহার বুকের উপর দাঁড়াইয়া শিবা মা-কালী নৃত্য করিতে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লীলা করিতে কিছুতেই ইচ্ছা করিবেন না, সমর্থা হইবেন না। শক্তির আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধককে শবতুল্য হইতে হইবে—ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

কালী

সংযম না করিলে বীর্য্যলাভ হয় না, পার্থিবভাব দূর করিতে না পারিলে দেবভাবের আবির্ভাব অসম্ভব, পশুভাব থাকিতে প্রকৃত বীরভাব কি করিয়া আসিবে? অমৃতত্ব লাভ করিবার রাস্তা যে মৃত্যুর ভিতর দিয়া। শাক্ত কালীভক্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূর করিয়া মুক্ত হইয়া প্রকৃত বীর হইয়া কিভাবে জগতে লীলা করিতে হয়। তাহার সংযম ভোগের জন্য, তাহার মৃত্যু অমৃতত্বলাভের জন্য। বৈষ্ণবদের আদর্শও অনেকটা এইজাতীয়। শিবের বুকের উপরে শিবার লীলা বৌদ্ধদের শূন্যবাদেরও পরের অবস্থা বলিয়া মনে হয়। শিবতত্ত্বে সব শূন্যে পরিণত হইয়া

গিয়াছে, তাহার উপরে মা ভগবতীর অপ্রাকৃত লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মদনভস্ম করার পরে শিবের বিবাহ পূর্ণ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া পূর্ণভাবে অহংতত্ত্ব দূর করিয়া সাধক ভগবৎলীলার সহায় হইয়া থাকেন।

এখন দেখা যাউক সরস্বতীর বাহন কেন হংস। সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা; ইঁহার পূর্ণ বিকাশ সেখানেই সম্ভবপর, যেখানে সাধক "তত্ত্বমসি" সাধনা দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-ভাব স্থাপন করিয়াছেন। 'অহং সঃ' আমি তিনি এবং 'সঃ অহং' তিনি আমি, এই দুই ভাবের সাধনার মন্ত্র হইতেছে 'হংস'—যাহা দ্বারা জীবাত্মাপরমাত্মার একত্ব উপলব্ধি হয়। এই সাধনার পরিণামে সাধক হংসাবস্থা লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, সরস্বতী দেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যে সব যোগীপুরুষ নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে এই হংসমন্ত্র অজপা জপ সাধন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলাইয়া উভয়ের একত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও যে হংস পরমহংস আদি নামে অভিহিত। এই হংসাবস্থা লাভ করিতে না পারিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ সরস্বতীর আগমন আবির্ভাব অসম্ভব, তাই সরস্বতীর বাহন সরস্বতীর সাধক হংস।

সরস্বতী

লক্ষ্মীর বাহন পেচক। পেচক আলো সহ্য করিতে পারে

না, আলো জ্ঞানের ধর্ম্ম ; সেজন্য যাহারা সাংসারিক ঐশ্বর্য্য-লাভে সচেষ্ট, তাহারা প্রকৃত জ্ঞানালোক আত্মতত্ত্বের বিচার দেখিয়া ভয় পায়। পাছে অর্থে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া সংসারে সাংসারিক ভোগস্পৃহায় বৈরাগ্য জন্মে, এজন্য ধনীরা ধনলোভী বণিকগণ তাঁহাদের ছেলেমেয়েদেরে জ্ঞানীর সংসর্গ হইতে জ্ঞানের আলোচনা হইতে দূরে রাখিতে ভালবাসেন। তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন চন্দ্রের আলোক—মনের কল্পনাজল্পনা (speculation), অর্থাগমে যতটা পরোক্ষ জ্ঞানের (reflected light) প্রয়োজন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, পেচক সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব (wise as an owl) ; পেচকের মত বুদ্ধি রাখিতে ধনীকে উপদেশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পেচকগণ নাকি ভাল ভাল দ্রব্যসংগ্রহে অতি সুনিপুণ ; ইহাদের বাসায় অনেক অদ্ভুত রকমের জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাকি কোনও দ্রব্যের অপব্যবহার ভালবাসে না—বণিকেরা এতত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহারাও যে পেচকধর্ম্মী।

লক্ষ্মী

যিনি ঐশ্বর্য্য ধন-দৌলত চান, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত ; তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে অজ্ঞানতা—অজ্ঞানজনিত কামনা বাসনা আসক্তি। তাই বোধ হয় মা-লক্ষ্মী আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সাধুসজ্জনদেরে আশ্রয় না করিয়া তামসিক পেচকধর্ম্মী বণিকদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন—তাঁহারাই

মায়ের বাহন। তাঁহাদের মধ্য দিয়াই তিনি আপন মহিমা-বিস্তারে শোভা পান। প্রবাদ আছে যে, সরস্বতীর সাধকগণ চিরকাল দারিদ্র্যদুঃখ-দহনে প্রপীড়িত থাকেন "যে জন সেবিবে ওপদ-যুগল সেই তো দরিদ্র হবে"।

লক্ষ্মী প্রবেশ করেন তামসিক কৃপণ বণিকদিগের ঘরে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"; কিন্তু প্রতিষ্ঠালাভ করেন ভোগবিলাসের মধ্য দিয়া। সেইজন্য বোধ হয় বণিকদের ছেলেরা অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ নানারূপ ভোগবিলাসের মধ্য দিয়া উড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা যে আমার চির-চঞ্চলা, মা যে আমার ভগবৎশক্তি; তাই বাহিরের তামসিক অর্থ যে অনেক সময় অনর্থের কারণ, তাহা দেখাইয়া দিয়া পারমার্থিক অর্থের দিকে সাধকের মন আকর্ষণ না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। সেখানেও সেই পারমার্থিক ধনের আস্বাদ পাইয়া সাধক লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তস্থানে অতিগোপনে পেচকের মত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পারমার্থিক ঐশ্বর্য্যের সাধকও তাই পেচক-ধর্ম্মাবলম্বী।

দুর্গতিহারিণী মা দুর্গা আমার সিংহবাহিনী। ইনি জীবের সকল রকম দুর্গতি নাশ করিয়া তাহার পরমানন্দপ্রাপ্তির সহায় হন। হিংসাই হিংস্র জন্তুর প্রধান ধর্ম্ম। সিংহ পশুর রাজা, সুতরাং তাঁহার হিংসাটা একটু রাজারই মত। তিনি যে-সে পশু হিংসা করিয়া আপন রাজগৌরব

দুর্গা

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছা করেন না। রজোভাবাপন্ন পশুরাজ আজ মায়ের বাহন হইবার জন্য অনেকটা সাত্ত্বিক ভাবে আবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিলেন, তাই তিনি আজ হিংসা করিতে চান জীবপশুর জীবভাবকে—'আমি' 'আমার' এই অহংভাবকে। জীব যখন তাহার অহংভাবকে সাধনরাজ্যের পরমপদপ্রাপ্তির প্রধান বিঘ্ন মনে করিয়া আত্মনিবেদন-তত্ত্বের মধ্য দিয়া আপন জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হয়, তখনই যে সে ত্রিবিধ তাপের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কামাদি অসুর সাধনভজনের প্রধান বিঘ্ন, এই সব পশু বিনাশ করিতে সংযত করিতে না পারিলে জীবের মধ্য দিয়া মা আত্মশক্তি ফুটিয়া বাহির হইতে পারেন না। মায়ের কৃপালাভ করিতে হইলে, মাকে প্রকাশ করিতে প্রচার করিতে হইলে তোমাকে সব পশুভাব দূর করিয়া বীরভাব লাভ করিতে হইবে—বীর হইতে হইবে সিংহ হইতে হইবে। তোমার সিংহত্ব সিংহভাব, সিংহবাহিনী ভগবতীর আগমনের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিবে। কাপুরুষের ভিতর দিয়া শক্তির বিকাশ অসম্ভব। শক্তি বাস করে শক্তিমানের ভিতরে, প্রকাশ পায় সিংহপ্রকৃতি বীরপুরুষের মধ্য দিয়া।

আমাদের মঙ্গলময় শিবের বাহন বৃষ। বেদাদি-গ্রন্থে ধর্ম্মকে বৃষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—চারিবেদ তাহার চারিপদ,যাহার সাধনায় চতুর্বর্গ ফল লাভ করা যায়। সাধন-

চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া এই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হয়। শিবের সাধককে শিবের বাহনকে চারি বেদের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিয়া শিবরূপী পরমমঙ্গলময় পরমাত্মার আরাধনা করিতে হইবে। নিজের ও অপরসকলের কল্যাণসাধনে ইচ্ছা থাকিলে তোমাকে প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ বেদের তত্ত্ব মঙ্গলময়ের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে। মঙ্গলময় শিবকে সুখী করিতে ইচ্ছা থাকিলে—শিবের সাধক হইতে হইলে, সর্ব্বত্র মঙ্গলময় ভগবৎইচ্ছার বিকাশ দেখিয়া সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হইতে ইচ্ছা থাকিলে হে শিবসাধক! তোমাকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে; উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে সংযম অভ্যাস করিয়া তোমাকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। শিবের সাধকের পক্ষে বৃষ না হইলে—ধর্ম্মের জীয়ন্ত বিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হইতে না পারিলে, তাহার কথা ভাব ও কাজের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম ফুটিয়া বাহির না হইলে যে চলিবে না।

শিব

আমাদের বিষ্ণু-ভগবানের বাহনটি গরুড়। বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যদেবকে বিষ্ণু-ভগবানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সূর্য্য জগতের প্রাণ, সূর্য্যের আরাধনা দ্বারা প্রাণশক্তি কার্য্যশক্তি পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এই বিষ্ণু-ভগবানের বাহনটিকে সেখানে বিদ্যুৎশক্তি প্রাণশক্তি-

বিষ্ণু

রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণের স্থিতিশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যখন বিষ্ণু-ভগবান, তখন যাহাতে মানুষের স্থিতির কাজ জীবনলীলা আনন্দের সহিত নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এইভাবে জীবের কল্যাণসাধনে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা গরুড়প্রকৃতি সাধক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। সূর্য্যউপাসক প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া-তৎপর সাধকগণও বিষ্ণুর বাহন গরুড়-ভাবাপন্ন। যাঁহারা দেশের কাজে জীবের সেবায় জগতের কল্যাণসাধনে জাবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু-ভগবানের প্রকৃত সাধক। ভাগবতে বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষ এবং তিন বেদকে গরুড়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, "ত্রিবৃদ্ বেদঃ সুপর্ণস্তু যজ্ঞং বহতি পুরুষং" (দ্বাদশ স্কন্দ)। বেদত্রয়-স্বরূপ গরুড় যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু-ভগবানকে বহন করিয়া থাকেন। তিন বেদকে উত্তমরূপে অবগত হইয়া জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন-পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সাধনায় সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে তৎপর হন, তিনিই বিষ্ণু-ভগবানের প্রকৃত সাধক; তাঁহাকেই উক্ত গরুড় নামে অভিহিত করা যায়।

গণেশ গণের সর্ব্বসাধারণের (mass) ঈশ ঈশ্বর চালক। মহাত্মা গান্ধীকে এ যুগের গণেশাবতার বলা যাইতে পারে। গণেশ কলাবধূর শিল্প-বাণিজ্যের প্রভু (master of art and industry), গণেশ সর্ব্ব কার্য্যের সিদ্ধিদাতা। কর্ম্মফল—কর্ম্মফলে স্পৃহাই

গণেশ

যাবতীয় বন্ধনের কারণ ; এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাই সিদ্ধিলাভের উপায়। বেদভাষ্যকার সায়ণও বোধ হয় সেইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন "মুষ্ণাতি অপহরতি কর্ম্ম-ফলানি ইতি মূষিকঃ", যে জীবের কর্ম্মফল নাশ করিয়া দেয়, সে-ই মূষিক। মুক্তিকামী ভগবৎদর্শনাভিলাষী সাধকগণ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়া পরম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। সুতরাং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধককে মূষিকধর্ম্মী হইয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করিতে হইবে।

ইহার পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের মনসা দেবীর বাহনটি সর্প। মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যোগ-

মনসা

শাস্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া যে মনের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করা যায়, তাহা যোগীগণ অবগত আছেন। এইভাবের সাধনা দ্বারা কুটিলগতি সংসার-বিষের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, যট্চক্রভেদকারী যোগীকে সর্পাঘাতেও বিচলিত করিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভাষ্যকারগণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের এইভাবের একটা ভিতরের তত্ত্ব দেখাইয়া প্রকৃত দেবতাতত্ত্ব যে শুধু বাহিরের স্থূল প্রতীকে পর্য্যবসিত নহে, পরমাত্মাই যে সব দেবতার অন্তরাত্মা, ভগবদ্দর্শনই যে দেবতাপূজার উদ্দেশ্য, তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

ভিতরের বর্ণনাটি বাহিরের মূর্ত্তিতত্ত্বকে খণ্ডন না করিয়া বরং মণ্ডনই করিয়া থাকে। মূর্ত্তি ভিতরকার সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল অভিব্যক্তি। এই মূর্ত্তি—মূর্ত্তিপূজা যে শুধু স্থূলে সীমাবদ্ধ নহে, ইহার ভিতর দিয়া যে সাধক ভগবানেরই পূজা করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকাশ করে। যাহা মানসিক জগতে কারণরূপে অবস্থিত ছিল, তাহাই আবার স্থূলজগতে কার্য্যরূপে সকলের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইল। স্থূলের ভিতর দিয়া কি করিয়া সূক্ষ্মে কারণে গুণাতীত অখণ্ড অব্যয়-তত্ত্বে পৌঁছান যায়, তাহাই যে এই মূর্ত্তি ও বাহনতত্ত্ব হইতে সুন্দরভাবে অবগত হওয়া যায়। ভিতরের ভাবটা জানা থাকিলে স্থূলতত্ত্বটা ঠিক ভাবে বুঝিবার, স্থূল-সূক্ষ্মের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া গুণাতীত স্বরূপে গিয়া উপস্থিত হইবার রাস্তাটা যেন সহজ হইয়া যায়। দেবতাতত্ত্বের ইষ্টতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্যনির্ণয়ে সমর্থ হই; বাহনতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা একটী প্রকৃত আদর্শ জীবন লাভ করিয়া নির্ণীত সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ লাভ করি। দেবতা লক্ষ্য (end), বাহন তাহার সাধক (means),—দেবতা বাহনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হন, সিদ্ধি সাধকের জীবনের মধ্য দিয়া পূর্ণ সফলতা লাভ করে। বাহনটি যন্ত্র আর তাহার দেবতাটি তদধিষ্ঠিত চৈতন্য। চৈতন্য ভগবৎশক্তি দেহাদি

মূর্ত্তি

যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। বাহন তত্ত্বকে বহন করিয়া আনে।

ভগবৎধাম রহিয়াছে কারণ শরীরেরও উপরে—সহস্রারে গুণাতীতপ্রদেশে। সেখানে প্রকৃতির বিকৃতি নাই, সুতরাং অহংতত্ত্বের প্রসার, এমন কি উৎপত্তিও হয় নাই। সিদ্ধাবস্থায় না গেলে সেখানে পৌঁছান যায় না। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বদা সেখানে থাকিয়া নিত্যানন্দ আস্বাদ করেন, সাধন-সিদ্ধগণ সেখানে যাইতে পারেন। উন্নত সাধকদের ভিতর দিয়া সে দেশের একএকটা ভাবস্রোত ফুটিয়া বাহির হয়, তখন আমরা তাহাকে 'আবেশ' নামে বর্ণনা করি—সেগুলি ভগবৎভাব। যাঁহাদের মন পূর্ণভাবে দেহাত্মভাব দূর করিয়া অনেকটা উপরে উঠিয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতভাবে দেবতার বাহন হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎধামে উপস্থিত থাকিয়া ভগবৎলীলা—রাসরহস্য আস্বাদ করিবার সুযোগ পান। সাধকগণ ভগবৎকৃপায় সাধনবলে তাঁহাদের ভিতরকার সব তত্ত্বগুলিকে ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া ভগবৎলীলা-আস্বাদনের উপযুক্ত করিয়া তোলেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের স্বর্গরাজ্য যেন মর্ত্তে আবির্ভূত হয় (Thy kingdom come)। অবতারদের—এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গী পার্ষদগণের ভিতর-বাহিরটা অনেকাংশে ভগবৎভাবে ভাবিত হইয়া পড়ায় তখন তাঁহারা ভগবৎ-

লীলাস্বাদনের যোগ্যতালাভ করেন। ভগবান ভগবানের দেবতাগণ এই সব দেহগুলিকে বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া জগতে আপন মহিমা বিস্তার করেন।

বলিদান

······বলিদান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুইএকটি কথা বলিব; এখনই নাইনিতাল যাইতে হইবে, মোটেই সময় নাই। বলিদান কথাটি ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। যাঁহারা পশুহিংসা করেন না, তাঁহারা দেবতাকে নিবেদিত অন্নকে প্রসাদকে বলি বলেন, আর তাহা সকলকে বিলাইয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ নিজেরা ভক্ষণ করেন। এই ক্রিয়াটা কতকটা যজ্ঞাবশেষ ভক্ষণের অনুরূপ। প্রায় সকল ধর্ম্মেই একটা বলির ভাব বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই জীবাত্মাকে জগতের কল্যাণসাধনে নিজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়া রাখা, এই বলির ভিতরকার তত্ত্ব। প্রসাদ দিতে হইবে—নিজের সাধনার ফল বিতরণ করিতে হইবে আগে অপর সকলের ভিতরে, তারপরে অবশিষ্ট অংশ লাগিবে নিজের ভোগে।

অহংতত্ত্ব স্বার্থভাব-বিকাশের রাস্তাটা সমূলে বিনাশ করা হইল। বৈদিক-যজ্ঞে বিরাট পুরুষকে পুরোডাশময় প্রতীকে সীমাবদ্ধ করিয়া পাশবদ্ধ করিয়া তাহাতে বিশ্বরূপী শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া পরে সেই প্রতীকরূপী পুরোডাশকে এবং মন্ত্রপূত সোমরসকে সকলে মিলিয়া ভোজন ও পান করিতেন। পুরুষমেধ-যজ্ঞে আমরা সেই ভাবের বেশ সুন্দর আভাস পাইয়া থাকি। খ্রীষ্টিয়ানদের ইউচারিষ্ট-অনুষ্ঠানে যীশু পশুস্থান দখল করেন, রুটি ও মদ যীশুর মাংস ও রক্তের প্রতীকভাবে কল্পিত হইয়া মন্ত্রবিশেষ দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া সাধক-ভক্তদেহে প্রবেশ করিয়া সাধককে জীবের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রবর্ত্তিত করিত। উভয় স্থলেই দেখিতে পাই, পরমাত্মার দেহে সীমাবদ্ধ ভাবকে পশুত্বরূপে বর্ণনা করিয়া, তাহার পশুত্ব—সীমাবদ্ধভাব দূর করিয়া, তাহাকে পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই পশুযজ্ঞের বলিপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত জগৎব্যাপী সৃষ্ট্যাদি লীলার মধ্যে এই যজ্ঞ এই বলিদান-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পশুবধ এই বলিদান-ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিভাব দূর করিয়া একটা মহান্ বিরাট সমষ্টিভাবের মধ্যে গিয়া পড়ি; ইহার সাহায্যে জীব তাহার সীমাবদ্ধ জীবভাব পশুভাব (পাশবদ্ধো ভবেৎ পশুঃ) দূর করিয়া পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। "তত্ত্বমসি

শ্বেতকেতো” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “সোঽহং” ইত্যাদি মন্ত্রগুলি এই পশুমেধে এই বলিদানপ্রণালীতে প্রযোজ্য।

এই তো গেল ভিতরকার আসল আধ্যাত্মিক বলিদান-তত্ত্ব। কিন্তু জীব যে কামাদি রিপুগণের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-গুলির তাড়নায় ভিতরকার পশুভাবগুলির—কামনা বাসনা আসক্তি আদি সীমাবদ্ধ ভাবগুলির অত্যাচারে আসল বলিদান-ক্রিয়ার যোগ্যতালাভে সমর্থ হয় না। সেজন্য আধিদৈবিক মানসিক সাধনক্ষেত্রে কামাদি পশুগুলিকে কামনা-বাসনা-আসক্তিআদি সীমাবদ্ধ ভাবগুলিকে মায়ের কৃপায় মায়ের মন্দিরে বলিদান করিয়া, এই সব ইন্দ্রিয়-গুলিকে মায়ের কার্য্যে জীবের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দেওয়াই মানসিক বলিদানের উদ্দেশ্য। রাজসিক সাধকগণ এই সাধনার অধিকারী।

আমরা সমাজে যে ভাবের বলিদান দেখিতে পাই, তাহা কেবল তামসিক পূজাতেই অনুষ্ঠেয়। এইভাবে মায়ের সন্তানরূপী জীবগুলিকে মায়ের সকাশে কশাইর মত বধ করিয়া মায়ের তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা, ঘোর তামসিক অজ্ঞানী লোকের ভিতরেই শোভা পায়। ঋষিগণ যে এই ভাবের বলির মোটেই অনুমোদন করেন নাই, তাহা বলা যায় না; তবে তাঁহারা ইহা অনুমোদন করিয়াছেন তামসিক লোকদের জন্য। ইহার অনুষ্ঠাতা যাহাতে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সব

তামসিকপ্রকৃতি লোক হিংসাদি কার্য্যে নিরত, পশু দেখিলেই তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস দ্বারা উদর পূরণ করিতে একান্তভাবে লোলুপ, তাহাদিগকে আস্তে আস্তে একটা সংযমসাধনের মধ্য দিয়া সাত্ত্বিকপূজার অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্যই এই তামসিক বলিদানের ব্যবস্থা। আচ্ছা তুমি মাংস ভালবাস, মাংস না হইলে তোমার চলে না, তুমি আমার সঙ্গে এস—আমি তোমার মাংস-ভোজনজনিত সুখেরও ব্যবস্থা করিব, অথচ তাহার মধ্য দিয়া তুমি কল্যাণের পথে আনন্দের পথে চলিবার সুযোগ পাইবে। তুমি অমাবস্যার দিনে বিধিমত মায়ের পূজা করিয়া পশুকে মন্ত্রপূত করিয়া মাকে নিবেদন করিয়া পরে সেই মাংস ভক্ষণ করিও। মাংস-ভক্ষণটা সাধনায় পরিণত হইয়া যাইবে শুনিয়া, পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার লোভে তামসিক সাধক এতটুকু সংযম করিতে স্বীকৃত হইল। অজ্ঞাতসারে তাহার হিংসার ভাবটা একটু কমিয়া গেল।

মাতৃভাবাপন্ন বাৎসল্য-রসে বিভোর মাতৃমূর্ত্তির নিকটেই বিশেষভাবে বলিদানের ব্যবস্থা করা হইল—উদ্দেশ্য, যাহাতে মার কাছে সন্তানকে বধ করা যে জিনিস, একদিন সে তাহা বুঝিবার সুযোগ পায়। মায়ের ধ্যান, মায়ের মন্ত্র, বধ্য পশুর স্বরূপ, বলিদান-ক্রিয়ার মন্ত্র ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহা চিত্তশুদ্ধির সহায়; যাহা মার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ—মার বাৎসল্যভাবকে আপনা

হইতে মনের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিবে। মায়ের কৃপায় অদৃষ্টগুণে সাধকের মনে হইবে—আমি এ কি করিতেছি, নিজের স্বার্থের জন্য লোভে পড়িয়া মার সম্মুখে মার ছেলেগুলিকে বধ করিয়া মায়ের তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিতেছি! মা যে আমার দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে সদা তৎপর; মায়ের সম্মুখে এইভাবে মায়ের অবোধ সন্তানগুলিকে বধ করিয়া কিরূপে আমরা নিস্তার পাইব! ধিক্ আমাদের অজ্ঞানতায়, ধিক্ আমাদের কুসংস্কারে—ইহার প্রভাবে আমরা এতদিন এইভাবে পাপের পথে বিনাশের পথে ধাবিত হইয়াছিলাম। কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই তো আমরা এইরূপ জঘন্য কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছি; ইহারাই তো আমাদের প্রধান শত্রু, ইহারাই তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভিতরকার পশু। এখন যে উপায়েই হউক, এই পশুগুলিকে বধ করিতে হইবে। রিপু বিনষ্ট, ইন্দ্রিয় সংযত এবং চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত না হইলে যে প্রকৃত কল্যাণের আর আশা নাই। এইভাবে তামসিক সাধক রাজসিক পূজার অধিকার লাভ করে।

বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, অহিংসা-মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই একদিন বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখন একবার ভাবিয়া দেখ যে, যাঁহারা সমাজের এই তামসিক বলিদানের বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াও নিজেরা মাছ-মাংস খাওয়ার লোভ ছাড়িতে পারেন না, তাঁহাদের অবস্থা

এই তামসিক সাধকদের চেয়ে বেশী খারাপ কি না ? ইহাদের বলিদানের মাংস খাওয়ার মধ্যে তবুও একটা সংযমের সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু এই নিন্দুকদের মাংস খাওয়ার মধ্যে যে আর সেইরূপ উন্নতিরও কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরা মাকে ফাঁকি দিতে পেটকে সুখী করিতে গিয়া যে কিভাবে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহা বোধ হয় একবারও ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান না।

ফলদান

...অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে যে, কোনও দেবতা দর্শন করিতে গেলে সেই দেবতাকে নিজের কোনও একটি প্রিয় ফল দিয়া আসিতে হয়। যে ফল একবার দেওয়া যায়, জীবনে সে ফল আর কখনও ভোগ করিতে নাই। আগে দেবতা ছিলেন ইষ্ট অভিলষিত প্রিয়তম, তাই লোকেরা ইচ্ছা করিয়া আপন আপন প্রিয় ফলটি তাঁহাকে প্রদান করিত ; ইহার ভিতরে বেশ সুন্দর একটা সংযমের ভাব ত্যাগের ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাদের এখন প্রাণ হইতে দেবভক্তি প্রায় চলিয়া গিয়াছে ; সমাজের খাতিরে, অভিসম্পাতের ভয়ে, যাহা কিছু একটু ভক্তি না

দেখাইলে চলে না; তাই আমরা ভক্তির একটা ভাণ করিয়া থাকি মাত্র, তাহার মধ্যে আন্তরিকতার চিহ্ন আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় যে আমরা ঠাকুরকে দেবতাকে ফাঁকি দিতেও কুণ্ঠিত হই না, "ঠাকুর পূজার কলা" কথাটি তাহার সাক্ষী। ইহার ফলে আমরা আমাদের সমাজের খাতিরে লোকনিন্দার ভয়ে অন্ধবিশ্বাসের ফলে দেবতাকে যে কোনও একটা অপ্রিয় ফল প্রদান করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা দেশের লোকাচারকে রক্ষা করিয়া থাকি।

এখন দেখা যাউক, এই ফল দেওয়ার প্রথাটা আসিল কোথা হইতে? হিন্দুদের কর্ম্ম করিতে অধিকার আছে, ফলের কামনা রাখিবার অধিকার নাই—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মের ফল যজ্ঞের ফল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু-ভগবানে নিবেদন করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কর্ম্ম করিয়া যাইব, ফলদাতা শ্রীভগবান যখন যে ফল প্রদান করিবেন, তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। দেবতাকে ফল—কর্ম্মফল দান না করিলে সিদ্ধির প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই। আমাদের বুদ্ধির দোষে পুরোহিতের স্বার্থসিদ্ধির আশায় এই কর্ম্মফল সামান্য একটা গাছের ফলে পর্য্যবসিত হইয়া, দেবতাকে ফলদান করার প্রথাটা একটা ঘোর তামসিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ষোলআনা

ফলদানের ন্যায় ষোলআনা দান করার প্রথাটাও বিশ্রী-ভাবে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ষোলআনা শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ জিনিসটি—আমাদের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তখানি। দেবতাকে ষোলআনা দান শব্দের অর্থ, আমাদের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তটা দেবতাকে শ্রীভগবানকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। একদিন ইহা ছিল আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা অবস্থা। শুনিতে পাওয়া যায় বৃন্দাবনের গোপীগণ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই ষোলআনা দান করিয়া সাধন-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্ত শ্রীভগবানকে দান করিতে হইবে, তাহার সমস্তই যে শ্রীভগবানের তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিতে হইবে; ইহার ফলে আমার দেহটি হইয়া যাইবে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র, আমার ধন-সম্পত্তি হইয়া পড়িবে শ্রীভগবানের লীলার উপকরণ—জীবসেবার সহায়, আমার ছেলে হইবে বাল-গোপাল, মেয়ে হইয়া যাইবে কুমারী ভগবতী, আমার সমস্ত কাজ হইয়া পড়িবে ভগবৎআরাধনা ভগবৎসেবা। সর্ব্বত্র ভগবৎভাব উপলব্ধি করিবার, সকল কাজকে পূজায় পরিণত

করিবার, অনাসক্তভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া সুন্দরভাবে সমস্ত কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়ার, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা যে আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। হায়! আমাদের বুদ্ধির দোষে এই আত্মনিবেদন এই ষোলআনা দান এখন একটা সামান্য রৌপ্যমুদ্রাদানে পর্য্যবসিত হইয়া পাণ্ডা-পুরোহিতদিগের স্বার্থসিদ্ধির সহায় হইয়া আমাদের জাতির একটা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হইয়া বসিয়াছে। নিজের কাজ করিব না, কর্ম্মফল ভাল করিব না—একটা আশীর্ব্বাদের জোরে একটা তামসিক দানের প্রভাবে হাতে হাতে সমস্ত তপস্যার ফল লাভ করিব, ইহা কি কর্ম্মফলবাদী আর্য্যজাতির পক্ষে কম বিড়ম্বনার কথা ?

ইন্দ্রের ভয়

……পুরাণে আমাদের ইন্দ্র-দেবতার সর্ব্বদাই যেন ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। যে-কেহ তপস্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন দখল করিবে—এমন কি তাঁহার প্রিয়তমা শচীরাণীর উপর আধিপত্য করিবে, ইহা ইন্দ্রদেব আর কি করিয়া সহ্য করিবেন ? এই কথা লইয়া বিচার করিবার সময় আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ইন্দ্র-দেবতাটি কে ?

বেদের যে ইন্দ্র পরম ব্রহ্ম, সে ইন্দ্রের মধ্যে এইভাবের প্রবৃত্তি কল্পনা করিতে যাওয়াও মূর্খতার লক্ষণ। যে ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া সাধক অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি সর্ব্বদা এইরূপ ভয়ে ভয়ে বাস করিবেন, ইহা যে কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, এক ব্রহ্ম যেমন অনন্তরূপে অনন্তভাবে বিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া অনন্তনামে বর্ণিত হইয়াছেন, আমাদের এই ইন্দ্র-দেবও তেমনি কতকটা প্রতিবিম্ব-ন্যায়ে বহুরূপে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইন্দ্র পরমাত্মা, ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র পার্থিব ধনসম্পত্তির বিধানকর্ত্তা। অগ্নি বরুণ কুবের আদি সকল দেবতার মধ্যেই এই ভাব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। যে ইন্দ্র সাধক-ভক্তদের তপস্যা সহ্য করিতে পারেন না, যে ইন্দ্র প্রহ্লাদআদি ভক্তগণকে প্রলোভন দেখাইয়া তপোভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে দুইটি তত্ত্ব, দুইটি ভাব, দুইটি রাস্তা। একটি ব্রহ্ম আর একটি জগৎ, একটি পারমার্থিক আর একটি বৈষয়িক, একটির পথ ভিতরের দিকে আর একটির পথ বাহিরের দিকে। একটি পর আর একটি অপর। এই পর-পদার্থটি পরমাত্মা, ইনি রহিয়াছেন গুহাহিত। ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া, চিত্ত হইতে যাবতীয় বিষয়ের সংস্কার দূর করিয়া সেই গূঢ় পথে

গিয়া সেই পরম পদার্থ দর্শন করিতে হয়। আর অপর পদার্থটি জগৎ—বিষয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব এই বিষয়ভোগ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তৃপ্ত থাকে—পরমপদার্থকে ভুলিয়া যায়।

ইন্দ্র-দেবতা এই বিষয়ভোগের সহায় অবশ্য নিজের আধিপত্যটি বজায় রাখিয়া। প্রজারা উন্নতি লাভ করুক সুখে থাকুক, রাজার এই ইচ্ছা হইলেও প্রজারা রাজা হইতে অধিক উন্নতি লাভ করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ-সিংহাসন অধিকার করুক, ইহা রাজা আর কি করিয়া সহ্য করিবেন? ইন্দ্র বিষয়ানন্দ লইয়া সদাই ব্যস্ত। কেহ সাধন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকিলেই তিনি মনে করেন, উহার উদ্দেশ্য বিষয়ভোগ—অসুরদের তপস্যার মধ্যে এই ভাব দেখিয়া তাঁহার এই বিশ্বাসটা যে পাকা হইয়া গিয়াছে। তাই কেহ উগ্র তপস্যা করিতেছে শুনিলেই পাছে তাঁহার ইন্দ্রত্ব অন্যে দখল করে, এই ভয়ে তিনি ভীত হইয়া থাকেন। পরে বিষ্ণু বা শিব যখন প্রমাণ করিয়া দেন যে এই সাধক ইন্দ্রত্বের অভিলাষী নন, তখন ইন্দ্র নির্ভয়ে বাস করেন।

ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে ভগবান্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ"; সেইজন্যই অধিকাংশ জীব বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে, পরমাত্মার দিকে ফিরিয়া চায় না "তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। অতি অল্পসংখ্যক সাধকই ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কামনাত্যাগ করিয়া অমৃতত্বলাভের জন্য ভিতরের অতীন্দ্রিয়-পথে বিচরণ করিতে চেষ্টা করে। নিষ্কাম ভক্তের

সংখ্যা যে বাস্তবিকই দুর্লভ। এমন কি, ইন্দ্র-দেবতা পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভক্তের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

গীতায় দেখিতে পাই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সুখকে বৈষয়িক মাত্রাস্পর্শ সুখ হইতে বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র ব্যস্ত এই বৈষয়িক সুখ লইয়া, নিষ্কাম ভক্ত ভোগ করিতে চান পারমার্থিক ব্রহ্মানন্দ—যে আনন্দ ইন্দ্রদেব কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। ইন্দ্রের এই ভয়ের বর্ণনা দ্বারা ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন, পার্থিব বৈষয়িক সুখের পরাকাষ্ঠা অবস্থায়ও ভোগীকে কিভাবে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়—বিষয়সুখে কোন তৃপ্তি নাই শান্তি নাই আনন্দ নাই। তার পরে দেখান হইয়াছে অকিঞ্চন নিষ্কাম ভক্তগণ কত ঊর্দ্ধে বাস করেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি-দেবতা হইতে কত শ্রেষ্ঠ—ইন্দ্রত্বকে ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখের পরাকাষ্ঠাকে তাঁহারা কিভাবে শূকরী বিষ্ঠাজ্ঞানে তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আনন্দ তৃপ্তি ও শান্তি ভোগ করেন, ইন্দ্র-দেবতা পর্য্যন্ত তাহা কল্পনার চোখে দর্শন করিতে সমর্থ নহেন। ইন্দ্রিয়সুখের অসারতা এবং নিষ্কাম ভক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখানই এই সব পুরাণের উদ্দেশ্য।

———

ষাটহাজার বৎসর তপস্যা

……বাস্তবিকই হিন্দুদের ষাট হাজার বৎসর তপস্যার কথা শুনিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া যান। নব্য শিক্ষিতেরা বলেন, হিন্দুদের কালসম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐ হিন্দুদের আবিষ্কৃত জ্যোতিষ-শাস্ত্র তাঁহাদের গণিত-শাস্ত্রে জ্ঞানের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকে। সংক্ষেপে তোমার কথার উত্তর দিতেছি, এখন বেশী লিখিবার সময় নাই।

হিন্দুমতে কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব, কর্ম্ম যজ্ঞ, কর্ম্ম উপাসনা, কর্ম্ম তপস্যা। হিন্দুগণ বলেন, একএকটি জীবাত্মার ভগবানের নিকট হইতে আসিয়া আবার ভগবানের কাছে ফিরিয়া যাইতে ভগবৎদর্শন করিতে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা করিতে ষাট হাজার বৎসর সময় লাগে; সুতরাং যখন যাহার ভগবদ্দর্শন ভগবৎপ্রাপ্তির কথা বলা হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তিনি অসংখ্য জন্মে ষাট হাজার বৎসর তপস্যা-কর্ম্ম সাধনা করিয়া আজ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্দর্শনে সক্ষম হইয়াছেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ শৈশবে সাধন আরম্ভ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে সিদ্ধাবস্থা লাভপূর্ব্বক ষাট হাজার বৎসরের তপস্যা পূর্ণ করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া গিয়াছেন।

যেখানে সিদ্ধির কথা, যেখানে ভগবদ্দর্শনের কথা, সেখানেই বুঝিবে, তাঁহাদের ষাট হাজার বৎসরের তপস্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই তপস্যা কবে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। ইহার আরম্ভ তাহার সৃষ্টির সময়ে, ইহার শেষ তাহার নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভে; মাঝে অতীত হইয়া গিয়াছে ষাট হাজার বৎসর—এই দীর্ঘকালব্যাপিয়া চলিয়াছে সাধনা ও তপস্যা। সুতরাং জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ষাট হাজার বৎসর সাধনা না করিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব; তবে তাহা যত জন্মেই লাভ হউক।

— ——

রাক্ষস

…বাস্তবিকই যে প্রায় সব পুরাণগ্রন্থে রাক্ষসগুলিকে মায়াবী বহুরূপীভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। রাক্ষসগণ নর-মাংসভোজী, দেবতাগণের পরম শত্রু। তোমার বোধ হয় সেই রাক্ষসের গল্পটি মনে আছে, যাহার সাহায্যে প্রাণায়াম-তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। মনে না থাকে তো আবার সংক্ষেপে একটু বলা যাউক।

একদা এক রাক্ষস এক ভৃত্যের বেশ ধারণ করিয়া কোন রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে সব কাজ করিতে

পারে অথচ বেতন চায় না শুনিয়া রাজা তাহাকে আপন সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তখন ভৃত্য বলিল, মহারাজ! আমাকে রাখিতে হইলে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারিবেন না; আর যখন আপনার কোন কাজ করিতে হইবে না, তখন আমার যাহা ইচ্ছা আমি করিব। রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ভৃত্যও কাজ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা তো আর জানেন না যে, ভৃত্যটি স্বরূপতঃ একটি রাক্ষস। রাজা যখন যাহা বলেন, ভৃত্য মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিয়া অন্য কাজের আদেশ পাওয়ার ভিতরেই মানুষ গরু সব খাইতে আরম্ভ করে। এইভাবে রাজত্বের অর্দ্ধেক জীব লোপ পাইল! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা সত্য-চ্যুত হইয়া তাহাকে তাড়াইতে অক্ষম।

রাজা যখন ভাবনায় অস্থির, তখন একজন সাধু গিয়া রাজার সব দুঃখকাহিনী শুনিয়া রাজাকে উঠানে একটা বাঁশ পুতিয়া রাখিতে বলিলেন; এবং পরে উপদেশ দিলেন যে, মহারাজ! ভৃত্যকে বলিয়া দিন যে, যখন তাহার কোনও কাজ না থাকিবে, তখন সে যেন এই বাঁশটি অবলম্বন করিয়া উঠানামা করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, দুইচার দিনের মধ্যেই ভৃত্য ক্লান্ত হইয়া ছুটি চাহিল। রাজার এত অনিষ্ট করিয়াছে, এখন তিনিই বা এত সহজে ছাড়িবেন কেন? পরিশেষে রাক্ষস প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইল যে, সে কখনও রাজার অনিষ্ট করিবে না; রাজা স্মরণ করিলেই আসিয়া প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিবে।

এই রাক্ষসটিই আমাদের মন। মনকে কোনও কাজে ব্যস্ত না রাখিলে সে দেহরাজ্যের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করে—Idle brain is the devil's work-shop. সাধকগণ যখনই সংসারের কাজ হইতে অবসর পান, তখনই এই মনকে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুষুম্নামার্গে যাতায়াত করিতে নিযুক্ত করেন; ইহার ফলে মন স্থির হয়, মনোনাশ-অবস্থা লাভ হয়।

এই গল্পটা পড়ার পর হইতে পুরাণ পড়িবার সময় রাবণাদি রাক্ষসের স্থানে মনকে বসাইয়া তাহাদের কার্য্য-কলাপগুলির মধ্য দিয়া মনের লীলা এবং তাহাদের বিনাশ-সাধনের মধ্য দিয়া মনঃস্থির করিবার উপায় অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। মন যে মায়াবী—মন যে বহুরূপী, তাহা মনের দিকে যাঁহারা লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারাই বলিতে বাধ্য হইবেন। মন এই মুহূর্ত্তে দেবতার বেশে আসিয়া দেখা দিল, আবার পর মুহূর্ত্তে অসুর-পিশাচের অভিনয় আরম্ভ করিল। রাবণাদি শ্রীভগবানের পার্ষদ ছিলেন—সংযত মন ভগবৎসেবার প্রধান সহায়, মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ রাধা-কৃষ্ণসেবায় বিভোর থাকিতেন। অপরাধ করিয়া শাপভ্রষ্ট হইয়া অসংযত হওয়ায় ফলে অসুরত্ব প্রাপ্ত হন—ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। মনও যে অসুরদের ন্যায় দিতির—খণ্ডনীয়া প্রকৃতিরই সন্তান।

ভাবিও না, আমি এইভাবে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

করিয়া পুরাণাদি-গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে বসিয়াছি। পুরাণাদি-গ্রন্থে অনার্য্য অসুরগণ অনেক স্থলে রাক্ষসরূপে বর্ণিত। তাহারা বাস্তবিকই নরমাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদের ধনুর্বিদ্যা ঐন্দ্রজালিক কৌশল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আর্য্যগণকে দেবভাবের আর অনার্য্যগণকে অসুরভাবের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া ভিতর-বাহিরের নিত্য-নৈমিত্তিক লীলার তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দেবতাদের মধ্যে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এবং অসুরদের মধ্যে মনোময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপনিষদেও অনেকস্থলে প্রাণকে অসু অর্থাৎ অসুর বলা হইয়াছে। ভিতরের ভাবে তাত্ত্বিকভাবে যাহা মনস্তত্ত্বের লীলা, বাহিরের ভাবে ঐতিহাসিকভাবে তাহাই আবার রাক্ষসদের কার্য্যকলাপ। একের কার্য্যকলাপ নিত্য বর্ত্তমান, অপরের কাজগুলি নৈমিত্তিক অবতারদের আগমনের সময়ই বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সব সাধক নিজের ভিতরে মনের খেলা প্রত্যক্ষ করিয়া সাধনবলে ভগবৎকৃপায় মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই পুরাণোক্ত রাক্ষসাদির বর্ণনা বেশ সুন্দরভাবে বুঝিবার ও আস্বাদ করিবার সুযোগ পান।

নরক

নরক-শব্দটি বোধ হয় বালক-শব্দের ন্যায় অল্পার্থে ক প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। অল্প নর—অপূর্ণ নর। যে অবস্থায় যেখানে জীব অপূর্ণ হইয়া সীমাবদ্ধ সংকীর্ণভাবে বাস করে—পূর্ণ পরিণতিলাভে অসমর্থ হয়, তাহাকেই নরক বলা যাইতে পারে। জগতে নিম্নতম অধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম অধিকারী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের সকলেরই বাস করিবার জন্য যথাযোগ্য ভূমি আছে। উচ্চতম স্থানকে স্বর্গ বলা হয়, নিম্নতম স্থানকে নরক পাতাল আদি নামে নির্দ্দেশ করা হয়; আর মধ্যের ভূমিকে সাধারণতঃ মনুষ্যের মধ্যশ্রেণী জীবের বাসস্থান মর্ত্তভূমি বলা হইয়া থাকে।

দেশগুলি যেমন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বা নরকভেদে ত্রিবিধ, আমাদের মানসিক ভাবগুলিও তেমনি দৈব মানবীয় ও আসুরিক-ভেদে ত্রিবিধ। জ্ঞান প্রেম দয়া সত্য পবিত্রতা আদি ভাব স্বর্গীয় বা দৈবভাব, হিংসা দ্বেষ অপবিত্রতা আদি আসুরিক বা নারকীয়ভাব; এবং এই উভয়ের সংমিশ্রভাব এই মর্ত্তলোকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব সাধুপ্রকৃতি লোক চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত, জ্ঞানে

প্রেমে আনন্দে বিভূষিত করিয়া সর্ব্বজীবহিতসাধনে রত আছেন, তাঁহারা স্থূল শরীরে মর্ত্তে বাস করিয়াও মানসিক স্বর্গে বিরাজ করেন। যাঁহারা ইহার বিপরীত—অসুর-ভাবাপন্ন. তাঁহারা ধনীগৃহে সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও যে নরকে বাস করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার মতে কাম ক্রোধ ও লোভই নরকের দ্বার। যাঁহারা কামনা বাসনা আসক্তিতে ক্রোধ লোভ ও মোহে অভিভূত, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে নরকে বাস করেন।

নরক-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে, সীমাবদ্ধ সংকীর্ণভাবই নরক এবং অসীম সর্ব্বগত ভাবই স্বর্গ। এইজন্য ভগবৎস্বরূপ জীবের স্বরূপ আনন্দধামের স্বরূপ দেখাইতে গিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী ভাবের একটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নরক মানেই যখন অল্প নর সীমাবদ্ধ নর অপূর্ণ নর, তখন পূর্ণ নর পরিণত নর আদর্শ মনুষ্য না হওয়া পর্য্যন্তই মানুষকে নরকে সীমাবদ্ধভাবে বাস করিতে হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি স্বার্থপরতা হিংসাদ্বেষ, এই সকলই তো মানুষকে তাহার নিত্য সর্ব্বগত স্বরূপ ভুলাইয়া দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া ছোট করিয়া নরকে বাস করায়। নতুবা যাঁর ভগবান সর্ব্বব্যাপী, যাঁর আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, তাঁর কি আর নরকে বাস করা বা নরক দর্শন করা সম্ভবপর হয়?

ভগবান সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং এমন স্থান থাকিতে পারে না, যেখানে তিনি নাই—যেখানটা নরক। তবে তিনি

যে সর্ব্বব্যাপী তাহা জানে কয়জন লোকে, জানিলেই বা চিন্তার সময় কাজের সময় মনে রাখে কয়জনে? যেখানে ভগবানকে মনে থাকে না, যে ভাব ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, ভগবৎভাবকে জীবাত্মার স্বরূপকে সীমাবদ্ধ-রূপে প্রতিপন্ন করাইয়া দেয়, তাহাই যে নরক। পৃথিবীতে ভাল স্থানও আছে, মন্দ স্থানও আছে; ভাল স্থানগুলির তুলনায় মন্দ স্থানগুলি নরক। যেখানে পবিত্রতা শান্তি আনন্দ নিত্য বিরাজিত, তাহাই যে স্বর্গ; আর যেখানে অপবিত্রতা অশান্তি দুঃখ-কষ্ট, তাহাই নরক। "মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তৎবিপর্য্যয়ঃ"। কুকাজ করিলে যে তাহার ফলে কুস্থানে নরকে গিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাও ঠিক।

নাস্তিক বৌদ্ধগণ ভগবানকে ভগবৎধামকে বাদ দিয়া মানুষকে সুপথে রাখিবার জন্য নরককে অতি ভীষণভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যাহাতে নরকের ভয়ে সুপথে চলিতে ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করে। পাপের শাস্তিভোগকে তাঁহারা যেরূপ ভীষণভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, দয়াময় প্রেমময় ন্যায়াধীশ ভগবানের সৃষ্ট রাজ্যে ঐরূপ একটা ব্যবস্থা থাকিতে পারে না।

উন্নতি ও অবনতি—দুইটি অবস্থাই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়; এই উন্নতির দিকে স্বর্গ আর অবনতির দিকে নরক অবস্থিত। যাহারা অবনত পতিত কুকার্য্যরত, তাহারা এখানেই নরকে বাস করে; আর যাহারা উন্নত সাধু সৎকার্য্যে রত,

তাহারা এখানে বসিয়াই স্বর্গসুখে বিভোর থাকে। নরককে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে— ভৌমিক নরক, মানসিক নরক ও আধ্যাত্মিক নরক। পৃথিবী-মধ্যস্থ কুস্থানগুলি ভৌমিক নরক, কুভাব এবং তজ্জনিত যাতনাপূর্ণ অবস্থা মানসিক নরক, অবিদ্যায় মায়ামোহে স্বরূপবিস্মৃতির অবস্থা আধ্যাত্মিক নরক। ইহারা আবার অল্পবেশীভাবে প্রত্যেকে বহুভাগে বিভক্ত। জীবের অপবিত্র মনই প্রধান নরক; এবং সেই মনের ভাবনাচিন্তা ভয়-অশান্তিই নারকীয় যাতনা।

———

নারদ

......নারদের কার্য্যকলাপ বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। সাধারণে তো নারদকে মহা ঝগড়াটে কোন্দলের ঠাকুর বলিয়া মনে করেন। নারদের ঝগড়াটা কিন্তু একটু অন্য রকমের। নিজে সর্ব্বদা প্রকৃতিব তালে লয় হইয়া থাকিতেন: তাই যেখানে বিকৃতি ব্যাধি অশান্তির সম্ভাবনা, সেখানেই নারদ গিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য বিকৃতকে প্রকৃতিস্থ করা, সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করা। কর্ম্মফল অনিবার্য্য, ভোগের শেষ না হইলে মানুষকে যে কর্ম্মের কর্ম্মফলের হাত হইতে

রক্ষা করা কঠিন। সূক্ষ্ম-দর্শনের ফলে দিব্য-দর্শনের প্রভাবে কাহার কোন্ কর্ম্মের ফলভোগের কতটা বাকী, কাহাকে কোন্ ভাবে লইয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র তাহার কর্ম্ম-ফলভোগ শেষ করাইয়া তাহাকে কল্যাণের পথে মুক্তির পথে চালিত করা যাইবে, জীবের কল্যাণের জন্য কোন্ পথ সহজ ও স্বাভাবিক, তাহা নারদের জানা ছিল। কর্ম্মফল-রহস্যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধবিজ্ঞানে নারদ বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সকলে বুঝিতে পারিত না। তিনিও তাঁহার মনের ভাব ভগবৎউদ্দেশ্য সকল সময় বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন না, সময় পাইতেন না—ততটা আবশ্যকতা সম্ভবতঃ মনে করিতেন না।

দেবতারা নারদতত্ত্ব, নারদের কর্ম্মরহস্য জানিতেন; তাই তাঁহারা নারদকে এত বিশ্বাস করিতেন। স্থূলদর্শী লোকে তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার কাজ আর কি করিয়া বুঝিবে? তিনি যে সর্ব্বদা দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। দেবতারা তাঁহার ভিতর দিয়া তাঁহার পরামর্শে তাঁহার সাহায্যে সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেন। অসুরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশপালনে সচেষ্ট থাকিত, তাঁহার উপদেশগুলিকে মঙ্গলময় মনে করিত। যেখানে দেবতারা অসুরের ভয়ে অস্থির অসুর দ্বারা প্রপীড়িত, সেইখানেই নারদকে সঙ্গে করিয়া দেবতাদিগকে শিবের নিকট বা বিষ্ণুর নিকট যাইতে হইত। ভগবানের যত গুপ্ত সংবাদ, তাহা নারদই মর্ত্তলোকে আনয়ন করিতেন।

নারদ দেবতাদের—এমন কি, ভগবানের একজন প্রধান দূত। নারদের কাজটা অনেকটা বাইবেলের Holy ghost এর অনুরূপ। কিন্তু অসুরদেরে সাময়িক উত্তেজনার ভিতর দিয়া বিনাশের পথে—মুক্তির পথে চালিত করিয়া, জগতের হিতসাধন করার কাজেও নারদ বিশেষভাবে দক্ষ। প্রকৃতির যে নিয়ম শিখিয়া যে ভাবের বরলাভ করিয়া অসুরগণ উদ্ধত হয়, সেই নিয়মের বলেই সেই অসুরের বধের রাস্তা ভগবান ঠিক করিয়া রাখেন। নারদ অনেকাংশে মানুষকে প্রকৃতির বিধানে চলিতে সাহায্য করেন। অসুরগণ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ বুদ্ধির দোষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দোষটা গিয়া পড়ে তখন চালকের উপরে, বৈজ্ঞানিক নেতার উপরে। আমরাও বুদ্ধির দোষে চাকুতে হাত কাটিয়া কর্ম্মকারের দোষ দিতে বসি।

এখন দেখা যাক্, নারদের এত আধিপত্য কোথা হইতে আসিল। নারদ সঙ্গীতশাস্ত্রের একজন প্রধান পণ্ডিত। তিনি ছন্দশাস্ত্রে প্রকৃতির কম্পন-তত্ত্বে (vibration) বিশেষ পারদর্শী। নিজেকে প্রকৃতির তালে মিশাইয়া দিতে, বিকৃত লোককে প্রকৃতির ছন্দে মিলাইয়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে নারদ বিশেষভাবে দক্ষ। তাঁহার সঙ্গীতে পশু-পক্ষী হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত, আপন আপন হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া তন্ময় হইয়া যাইত। নারদ এই দেহরূপ বীণাযন্ত্রে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী তারত্রয় মিলাইয়া, স্বতঃ উচ্চারিত প্রণবরূপ হরিগুণ-

গানে বিভোর থাকিতেন। অনেক সময় তিনি সমগ্র প্রকৃতির তালে তালেই আপনার ভিতরকার তাল মিলাইয়া, সেই দিকে মন দিয়া প্রকৃতির সঙ্গীত (music of the sphere) শ্রবণে বিভোর হইয়া যাইতেন। প্রকৃতির এই সঙ্গীত-শ্রবণে দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত সমাধিমগ্ন হইয়া যাইতেন। এই সঙ্গীতের তালে তাল মিলাইতে চেষ্টা করিয়া ঋষি-মুনিগণ সমাধিলাভ করেন, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্বরের তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদের অজপা-জপ এই প্রকৃতির তালে তালে নিষ্পন্ন হইয়া যাইত।

যোগীরা বলেন, "কেবল" অবস্থায় এই হরিনাম স্বতঃই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এইজন্যই তো বলা হয় "হরের্নামৈব কেবলম্"; ইহাই নাকি জীবের একমাত্র গতি। "নামজী নামজী জপি জাগহি যোগী" যোগীরাই নামজপ করিয়া সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া থাকেন। সকল সাধকেরই যে একই পন্থা। কবীর তো এই ভাবে ভরপুর। বেড়াইতে বেড়াইতে কাজ করিতে করিতে এইভাবের অজপা-সাধন আপনা হইতে চলিতে আরম্ভ করে। সমস্ত বিকার কাটিয়া গেলে এইভাবের সাধনই বোধ হয় স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। নারদ এইভাবের সাধনায় সিদ্ধ। তিনি ছন্দোবলে সঙ্গীতের শক্তিতে সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শান্তিস্থাপনে সক্ষম ছিলেন, ছন্দোবোধের বলে দেবলোকের কম্পনগুলি এলোকে বসিয়া পাঠ করিতে সমর্থ ছিলেন।

নারদ সমস্ত দেবকার্য্যের সহায়। শিবের বিবাহের সময় তাঁহার উপরে পড়িল নিমন্ত্রণের ভার। কংসবধের সময় দেবকার্য্যের সহায় হইলেন নারদ। ধ্রুবের তপস্যার সময় গুরুরূপে এই নারদই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাব-রাজ্যেও নারদ-তত্ত্ব বিভীষণাদির ন্যায় যে নিত্য পদার্থ, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই; তবে তাই বলিয়া আবশ্যক-বোধে তাঁহার মর্ত্তলোকে সাময়িক অবতরণকে আমরা অস্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের বুদ্ধির দোষে যে দ্বন্দ্বভাব সৃষ্টির মূল ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়, তাহাকে শুধু বিবাদ-বিসংবাদে সীমাবদ্ধ করিয়া দ্বন্দ্বের কর্ত্তাকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের চালককে কোঁদলের ঠাকুরে পরিণত করিয়া বসিয়াছি।

দীক্ষায় শুদ্ধি

"দীক্ষা না হইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না, পূজাদি-কার্য্যে অধিকার জন্মে না" এই কথাটির মধ্যে কিছু তত্ত্ব নিহিত আছে কিনা বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, দীক্ষা কি জিনিস। অতি প্রাচীনকালে শুধু বৈদিক দীক্ষাই সমাজে প্রচলিত ছিল, উপনয়নের সময় সকলকে গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত করা হইত। জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কতকগুলি সাধনপ্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই ছিল দীক্ষা। আর্য্যদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভগবৎপ্রাপ্তি—পূর্ণতালাভ। সমস্ত আচার-ব্যবহার কার্য্যকলাপকে এই পূর্ণতালাভের অনুকূল করিয়া তোলা হইয়াছিল। যাহার জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যে পূর্ণতালাভে সচেষ্ট নয়, যে কল্যাণ-সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়সংযমে চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়, যাহার ভাব শুদ্ধ নয়—কাজ শুদ্ধ নয়, তাহার উপর কোনও কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। নিষ্ঠার অভাবে তাহাকে কোনও কাজে অধিকারী মনে করা হইত না।

গুরু যখন ব্যবসাদার হইয়া পড়িলেন, সম্প্রদায়রক্ষার

জন্য লোকে যখন সত্যকে পর্য্যন্ত অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল; তখন গুরুভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য, লোককে গুরুর শরণাগত হইয়া থাকিবার জন্য স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয়াদি দেখাইয়া অনেক কল্পিত শাস্ত্র-বচন শুনাইতে আরম্ভ করা হইল—অনেকগুলি প্রবাদবচন প্রচলিত হইল। গুরুর যে সব গুণ থাকা দরকার, সেগুলি বিচার করা লোপ পাইল। কে-ই বা বিচার করিবে? সাধারণ লোকে জ্ঞানাভাবে শিক্ষার অভাবে ঘোর তামসিকতায় গড্ডলিকা-প্রবাহের মত ছুটিয়াছে।

সত্ত্বগুণের আদর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত সাধুসজ্জনকে ভক্তি করা কতকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। গুণের অভাবে স্বার্থের জন্য যখন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই নানারূপ ছল-বল ও কল-কৌশলের প্রয়োজন হয়। পিতার গুণ পুত্রে সংক্রমিত হওয়া কতকটা স্বাভাবিক হইলেও তাহার ব্যভিচার যে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বলা যায় না। পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তি, পুত্রের দোষের প্রতি উপেক্ষা, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণগুলিকে বংশপরম্পরাগত করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" আদি শ্লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। গুরুর আবশ্যকতা দীক্ষার উপকারিতা অস্বীকার না করিলেও যেভাবে সমাজে এইসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তাহার ভিতরে অপকারের সম্ভাবনা প্রচুর বলিয়া লোককে প্রকৃত-তত্ত্ব বুঝাইয়া

একটু সাবধান করিবার প্রয়োজন মনে হইতেছে। তামসিক স্বার্থপর লোককে ভক্তি করা, তাহাদের উপদেশ মতে চলিতে যাওয়া, আত্মোন্নতির ভগবৎপ্রাপ্তির বিশেষ প্রতিবন্ধক। যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে আর পরকে কি করিয়া সিদ্ধিদান করিবে! কয়েকটী ভাল কথা শুনিয়া লোকের কথায় বঞ্চিত হইয়া জীবনগত সমস্ত কাজের উত্তমরূপে বিচার না করিয়া কাহারও নিকট দীক্ষিত হইতে গিয়া বঞ্চিত হইও না। যাহার ধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই, কথা ভাব ও কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য নাই, যিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎ-উপলব্ধি করিয়া জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন নন, যিনি শরীর মন ও বাক্য দ্বারা কাহারও অনিষ্টসাধনে সমর্থ, যিনি স্বার্থপর বিলাসিতার বশীভূত—মিথ্যাবাদী ভোগরত, তিনি যে গুরু হইবার উপযুক্ত নন, তাহা মনে রাখিতে হইবে।

তোমার ইন্দ্রিয় যদি সংযত হয়, চিত্ত যদি শুদ্ধ ও শান্ত হয়, জীবসেবায় ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনে যদি তোমার প্রবৃত্তি জন্মে, সদাচারঅনুষ্ঠানে যদি তুমি আনন্দ পাও, তাহা হইলে তোমার পূজা ভগবান নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন, তোমার হাতের জল নিশ্চয়ই শুদ্ধ। শ্রীভগবান তখন তোমার প্রকৃত কল্যাণসাধনে নিজেই ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। এই সব সদ্‌গুণের অভাবে দীক্ষালাভ করিলেও যে তোমার হাতের জল দেবতার সাধুসজ্জনের অস্পৃশ্য, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। ভগবান ভাবগ্রাহী। তিনি তোমার

বাহ্যিক বেশভূষা কার্য্যকলাপ হইতে অকপট নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমের ভাবটী বাছিয়া লইয়া তাহা দ্বারা তোমার সাধন-ভজনের ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার নির্দ্দেশ করিবেন। যাহার ভাব শুদ্ধ নয়, তাহার কাজ শুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। শুধু একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রভাবে অন্তর্যামী ভগবানকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া দুরাশা মাত্র। তাঁহার বিধান অমোঘ। যে যেমন কার্য্য করিবে, সে তেমন ফলভোগ করিবে। তামসিক কাজ দ্বারা সাত্ত্বিক ফললাভ অসম্ভব। সমস্ত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত ভাবে অনুশীলন কর, চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা কর, ভগবৎভাব ভগবৎপ্রেম আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া তোমাকে সকল কাজে অধিকারী করিয়া তুলিবে।

একাগ্রতা

চিত্তকে একাগ্র করিতে পার না বলিয়া যে দুঃখ হয়, একথা শুনিয়া সুখী হইলাম। ভাল কাজ করিতে পারি না বলিয়া আমাদের কয়জনের মনে দুঃখ হয়? আমরা দুঃখ বোধ করিতে জানি স্বার্থে বাধা পড়িলে, আনন্দলাভে অসুবিধা হইলে। উন্নতিলাভে বাধা পড়িলে যে দুঃখবোধ

হয়, তাহা অন্ততঃ উন্নতিলাভের প্রবৃত্তির সূচনা করে। পিপাসা হইলেই তিনি জলের ব্যবস্থা করেন। আশা করি, শ্রীভগবান তোমার একাগ্রতালাভের সহায় হইবেন।......

একাগ্রতা-শব্দের অর্থ কি জান তো? যে অবস্থায় অগ্রে এক ছাড়া দ্বিতীয় কিছু বা কোনও চিন্তা থাকে না। এই এক কোথায় খুঁজিয়া পাইব? মনে কর, তোমার প্রিয়বস্তু তোমার সম্মুখে অবস্থিত। তাহার স্থূল দেহ তুমি দেখিতে ভালবাস। এখন এই স্থূল দেহের মধ্যেও একটা স্বগত ভেদ রহিয়াছে—হাত-পা নাক-কান চোক-মুখের ভিতর পরস্পর ভেদ। ইহাদের পরিণতির মধ্যেও ভেদভাব দেখিতে পাইবে। আজ মুখখানি প্রফুল্ল, কাল ছিল মলিন; আজ শরীরটি সুস্থ, কাল ছিল অসুস্থ,—এই পরিবর্ত্তনগুলিও দ্রষ্টার চিত্তে এক ভাব রাখিতে দেয় না। দেহের পোষাক আদিও অনেক রকমের ভেদভাব লইয়া আইসে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, এই দেহের দুইটি পরমাণুর মধ্যেও ভেদভাব রহিয়াছে। তারপরে প্রিয়জনের এই দেহের সঙ্গে অপর সকল ব্যক্তি বা বস্তুর দেহজনিত পার্থক্যও তোমার চিত্তে ভেদভাব আনয়ন করিবে। তারপরে ইহার মনের দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে যে চঞ্চলতাজনিত ভেদভাবের সীমা নাই। যে জিনিস তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান, তাহার চঞ্চলতা তোমার চিত্তে চঞ্চলভাব আনয়ন করিবে। যে নিজে স্থির নয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে

গিয়া তোমার চোখ কি করিয়া স্থির হইবে! জগতের সব পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তুমি আর কি করিয়া চিত্ত স্থির করিবে। বহুর দ্রষ্টার মনে বহুবৃত্তি বহুভাব আসাই যে স্বাভাবিক। এইজন্য সাধকগণ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, এই চঞ্চলতার মধ্যে কিছু স্থির আছে কি না, এই বহুত্বের পিছনে কোথাও একত্ব আছে কি না। তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন সেই পুরুষকে, যিনি "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্", যিনি সমস্ত চঞ্চল অনিত্যের মাঝখানে নিত্য শান্ত স্থিরভাবে বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের মাঝখানে চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান, যিনি এই বহু পদার্থের মধ্যে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে বর্ত্তমান, যিনি "অবিভক্তং বিভক্তেষু" সমস্ত বিভক্তির মধ্যে অবিভক্তরূপে বিদ্যমান। সেই একের দিকে চাও—একের দিকে লক্ষ্য কর, তোমার একাগ্রতা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই একাগ্রতালাভের উপায় "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্" যেখানে যেখানে তোমার মন যাইবে, তাহার ভিতর দিয়া তুমি সেই এক অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করিতে চেষ্টা করিবে।

আমরা কোন জিনিসকেই ভাল করিয়া দেখি না বলিয়া সেই একের সন্ধান পাই না, কাজেই একাগ্রতা আমাদের পক্ষে একটা অসম্ভব কথা। একটু ভাল করিয়া দেখিতে শিখ, ছেলেকে দেখিতেছ একটু ভাল করিয়া দেখ;

তোমার কামনা বাসনা আসক্তি সংস্কার আসিয়া ভাল করিয়া দেখিতে বাধা দেয়। এই সব প্রতিবন্ধক দূর করিয়া একটু ভাল করিয়া দেখিতে অভ্যাস কর। যত ভাল করিয়া দেখিবে, তত রস পাইবে আনন্দ পাইবে; কারণ আনন্দময় যে তাহার ভিতরে রহিয়াছেন। একটু ডুবিতে পারিলেই তাঁহার সন্ধান পাইবে। যত আনন্দ পাইবে, যত তার ভিতরে সেই একের সন্ধান পাইবে, ততই তোমার চিত্ত একাগ্র হইতে থাকিবে। কারণ চিত্ত চায় আনন্দ, সেই আনন্দ না পাইয়াই সে অন্যত্র ছুটিয়া যাইতে চাহিত। এই দেখার পরিণামে তোমার এই ছেলের ভিতর দিয়াই বাল-গোপালের দর্শনলাভ হইবে, তখন ছেলের নিকট হইতে চিত্তকে অন্যত্র লইয়া যাওয়াই যে একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে। এইভাবে স্ত্রী মা-বাপ ভাইভগ্নী-বন্ধু আত্মীয়স্বজনকে একটু ভাল করিয়া দেখিতে শিখ, ভাল করিয়া দেখিতে না জানিলে আর কি করিয়া দেখা জনিত আনন্দ লাভ করিবে, কি করিয়া তোমার একাগ্রতা অভ্যাস হইবে?

দেখিয়াছিলেন একদিন বৃন্দাবনধামের শ্রীশ্রীরাধারাণী তাঁহার প্রাণগোবিন্দকে, যে দেখার ফলে অন্য দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সাধকদের পক্ষে চিত্তকে বহুমুখী করাই বোধ হয় কষ্টকর হইয়া পড়ে। মনে রাখিবে, যত তোমার ইন্দ্রিয়ের ও ভাবের সম্মুখে এক থাকিবে, ততই স্বাভাবিক সহজভাবে তোমার একাগ্রতা-

বৃত্তি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে; যত তুমি পদার্থের বিষয়ের মধ্য দিয়া অন্তরস্থ সেই একের দিকে যাইতে পারিবে, ততই তোমার একাগ্রতা লাভ হইবে। আমাদের চিত্ত চায় সুখ, আর সেই সুখের মূল প্রস্রবণ বাস করেন অন্তর হইতেও অন্তরে। বাহিরে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গেলেও তাহা তো আর প্রকৃত সুখ নহে, তাহা মনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে না। তাই প্রকৃত সুখ না পাইয়া নরের মন বানরের মত এখানে ওখানে সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়। সুখলাভ করিতে হইলে একটু ডুব দিতে শিখ। বৈষ্ণবধর্ম্ম এই পরম সুখের অনুসন্ধানে মানুষের একটা লোভ তৈয়ার করিয়া দিতে চান; ফলে একাগ্রতা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলিকে দুষ্ট ছেলেদের স্বভাবের মত মনে হয়। কেহ পড়িতে বসিলে কতকগুলি দুষ্ট ছেলে আসিয়া তাহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। এখন, সে যদি ডাক শুনিয়াই ছেলেদের সঙ্গে একদিন চলিয়া যায়, তবে তাহারা অপর দিন দ্বিগুণ উৎসাহে ডাকাডাকি করিয়া পড়ার বিঘ্ন জন্মাইবে। কিন্তু সে যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে, পড়া ছাড়িয়া সে কিছুতেই উঠিবে না; তাহা হইলে ঐসব ছেলেরা তিন-চার দিন ডাকাডাকি করিয়া শেষে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর ডাকিতে আসিবে না। এদিকে বিক্ষেপের কারণ দূর

হওয়ায় মন স্থির হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। অন্য ছেলেদিগকে কেবল দুষ্ট বলিলে তো চলিবে না, নিজের মনও তো দুষ্ট। তাহাকে সংযত করিবার সংযত রাখিবার জন্য তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সর্ব্বদা দেখিতে হইবে, সে কোথায় যাইতেছে কি করিতেছে। মনের দ্রষ্টা হইতে পারিলে তাহার নিকট মন আর চাঞ্চল্য দেখায় না। "দৃষ্টাঽস্মীতি ন পুনর্দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য"। মাষ্টার মহাশয় দেখিতেছেন জানিতে পারিলে দুষ্ট ছেলেগুলি দুষ্টামি না করিয়া শান্ত হয়। যেখানে চাকরদের উপর প্রভুর দৃষ্টি থাকে, সেখানে চাকরগণ শান্তভাবে কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হয়।

সাধারণতঃ আমরা মনকে অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত আদর দিতে গিয়া বিগড়াইয়া তুলি। যে মা-বাপ ছেলেদের ঠিক ভাবে আদর করিতে ও শাসন করিতে জানেন, তাঁহাদের ছেলেগুলি কখনও অবাধ্য হয় না। যে ছেলে মা-বাপেয় নিকট আনন্দ পায়, সে অন্যত্র আনন্দ খুঁজিতে যায় না। মনটাকে কেবল শাসন না করিয়া একটু ভালবাসিতে শিখ, একটু পবিত্রভাবে আনন্দ করিতে শিখাও—আনন্দ করিতে দাও; দেখিবে, মন কত সহজে তোমার কথার বাধ্য হইবে। মন কিছু দেখিতে চাহিলে তাহাকে তাহা পবিত্রভাবে দেখিতে দাও; সেই দৃশ্যকে খুব ভাল করিয়া—এমন কি, তাহার ভিতরে আত্মা পরমাত্মা পর্য্যন্ত দেখিতে দাও দেখিতে শিখাও, তাহার দেখিবার সাধ মিটিবে দেখা সার্থক হইবে।

দেখিও না বলিলেই যে পরোক্ষভাবে দেখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ছেলেদের সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য, মন সম্বন্ধেও ইহা ঠিক তেমনি সত্য।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে দেখিতে পাই, বস্তুবোধের তীব্রতা (intensity of sensation) একাগ্রতালাভের সহায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভাবকে যতই তোমার লক্ষ্য পদার্থের—সেই একের অনুকূল 'উদ্দীপন বিভাব' করিয়া তুলিতে পারিবে, ততই তোমার পক্ষে একাগ্রতালাভ সহজ হইবে। "তচ্চিন্তনং তৎকথনম্ অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্ এতদেকপরত্বঞ্চ" সেই ইষ্টবস্তুর চিন্তন কথন, পরস্পরের মধ্যে তাহার আলোচনা তাহাতে তন্ময় হইয়া থাকিবার চেষ্টা, তোমার একাগ্রতালাভের সহায় হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ এই একাগ্রতাসাধনের জন্য ইষ্ট-তত্ত্বের মূর্ত্তিরহস্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; আমাদের বুদ্ধির দোষে সে সব সাধনা এখন অসাধনায় পরিণত হইতে বসিয়াছে। কোনও ব্যক্তিবিষয়ে বা বস্তু বিষয়ে একবার একাগ্রতা শিক্ষা হইলে তারপরে অন্যত্র একাগ্রতালাভ সহজ হইয়া পড়ে।

তার পরে ভাবিয়া দেখ, মন চঞ্চল হয় কেন? সুখের অন্বেষণে মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়। মনের বাহিরে যাওয়ার রাস্তা ইন্দ্রিয়; মন পঙ্গু, ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বের সাহায্য না পাইলে সে বাহিরে যাইতে পারে না।

এবার বাহিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হইলেই সে ভিতরের রাস্তা খুঁজিয়া ভিতরে যাইবে। যত ভিতরে যাইবে, তত প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইবে ; কারণ পরম সুখস্বরূপ যে রহিয়াছেন নিজের ভিতরে। সুতরাং একাগ্রতালাভের জন্য সুখলাভের জন্য আমাদের মন যাহাতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরে না যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পরম কারুণিক শ্রীভগবান আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে রাখিয়াছেন সম্মুখের দিকে। সুতরাং যতক্ষণ সম্মুখের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ মনকে বিষয়ের দিকে বিষয়ের সংস্কারের দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। কোনও মতে মনকে পিছনের দিকে লইয়া যাইতে শিখিলে মন আপনা হইতে স্থির হইবে, একাগ্রতাসাধন সহজ হইয়া পড়িবে। সাধকগণ এই জন্য মনকে পিছনের মেরুদণ্ডের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। রাক্ষসের গল্পটি স্মরণ কর। মনরূপ রাক্ষসকে কোনও নির্দ্দিষ্ট কাজে লাগাইয়া না রাখিতে পারিলে সে যে দেহরাজ্যকে ছারখার করিয়া দিবে। তাই ঋষিগণ এই মনকে পিছনের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্নামার্গের মূলাধার হইতে সহস্রারে এবং পুনরায় সহস্রার হইতে মূলাধারে যাতায়াত রূপ যজ্ঞে লাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। যখনই সময় পাইবে, মনকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া উঠানামার কাজে লাগাইয়া রাখিও ; মন-রাক্ষস সহজে বশীভূত হইয়া যাইবে। তারপরে সুষুম্নার মধ্যে

সমস্ত তত্ত্বগুলি অবস্থিত। যত উপরে উঠিবে, তত সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অনুভবে আসিবে; সর্ব্বোপরি সহস্রারে সেই পরম রসিকশেখর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইবে। যত তাঁহার সন্ধান পাইবে, তত চিত্ত একাগ্র হইবে।

তারপরে সংযম সদাচার নিয়ম একাগ্রতাসাধনের সহায়। সংযমে যে শক্তিলাভ হয়, সংযমের ফলে যে উচ্ছৃঙ্খলভাব দূর হইয়া চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সদাচার চিত্তশুদ্ধির সহায়—সদাচার চিত্তকে কুপথ হইতে কুকাজের অনুষ্ঠান হইতে রক্ষা করে। যাঁহারা বলেন ধর্ম্মের সঙ্গে আহারবিহারের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের চিত্ত যে কিভাবে চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া একগ্রতাজনিত পরমানন্দলাভে বঞ্চিত থাকে, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিয়ম (regularity) পালন করা চিত্তশুদ্ধির মানসিক বলবৃদ্ধির একাগ্রতাসাধনের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক। যখনই কোন-এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোজ কোন-এক নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে ব্রতী হইবে, তখনই দেখিতে পাইবে, কিভাবে কত বাধা আসিয়া সেই কাজ হইতে তোমাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিবে। তুমি যতই সেই বাধাগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিবে, ততই অনুভব করিতে পারিবে কিভাবে তোমার ভিতরে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। এই শক্তি তোমার একাগ্রতালাভের সহায় হইবে। দৈনিক কর্ম্মগুলিকে একটা

বেশ সুন্দর নিয়মে সংযত করিতে চেষ্টা কর। যখনকার যে কাজ, তখন তাহা সমাধা করিতে চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ ও মন পূর্ব্ব হইতেই তোমার নিয়মিত কার্য্যসাধনের অনুকূল হইয়া বসিবে। আফিমখোর যেমন তাহার আফিম খাইবার সময়টা জানিতে পারে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার আফিমটি না খাইলে চলে না, তোমার নিয়মিত কাজের নেশাটিও যেন তোমাকে সেইরূপ তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনের সহায় হয়। যে ব্যক্তি রোজ বেলা দশটার সময় আহার করে, তাহার পাকযন্ত্র যকৃতাদি সব ঠিক দশটায় সহজে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও জীর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। পরিপাক-শক্তি বজায় রাখিবার জন্য ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা।

আমাদের ইন্দ্রিয় মন ও সংস্কারগুলি আমাদের সব কাজের সহায়। তাহারা সংযত হইলে নিয়মিত সময়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্য-সাধনে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। যত ইহারা সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত কাজ করিবে, তত কাজে রস পাওয়া যাইবে—কাজটি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইবে; এবং ততই ইহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যের ফলে একটা একাগ্রতা লাভ হইবে। যে ঘরে ভাইভগ্নী মা-বাপ স্বামীস্ত্রী ছেলেমেয়ের ভিতরে বেশ একটা সদ্ভাব থাকে, সে ঘরে বেশ সুন্দর একটা কার্য্যশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক সেইরূপ যাহার আবার ইন্দ্রিয়

ও মন সংযত হইয়া পরস্পর একতালে চলিতে থাকে, তাহার পক্ষে চিত্তকে একাগ্র করা সহজ হয়। এইজন্য উপনিষদে বাক্যকে প্রাণে, প্রাণকে মনে ও মনকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের প্রাণ চায় সৌন্দর্য্য ও আনন্দ আস্বাদ করিতে। এই আস্বাদের জন্য স্থানবিশেষে স্থূলের কতকটা আবশ্যক হইলেও প্রকৃত আস্বাদ করে মন আর তাহার আস্বাদনের অবলম্বন ভাব। ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্রোত শব্দাদি গুণের আকারে মনের নিকট প্রেরণ করে, মন আপন চিত্তের ভাবরাশির সঙ্গে তাহা মিলাইয়া সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি ভোগ করে। এই মন যদি পূর্ব্ব হইতে এইজাতীয় ভাবের সংস্কারে ভরপূর থাকে, তবে তখন বাহ্যিক পদার্থের মধ্যে সে বেশী করিয়া ঐ সব আনন্দউপভোগের সুযোগ পায়। এজন্য যাঁহারা "শান্তং শিবং সুন্দরম্ আনন্দরূপমমৃতম্" এর উপাসনায় অভ্যস্ত, সেই পরম সুন্দর রসিকশেখরকে যাঁহারা ধ্যানযোগে অনুভব করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের চিত্ত ধ্যানানন্দলাভের ফলে একাগ্রতার অনুকূল হইয়া থাকে।

ওঁ তৎসৎ